নারীপ্রগতির জন্মকথা

শ্রীপ্রতিভা রায়

মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ভূমিকা

আমি প্রৌঢ়া বিধবা ; প্রাচীন চিন্তাধারার মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম। এই প্রাচীন সমাজব্যবস্থার অনেক ঝড় আমার জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাচীনের এই প্রাচীরের মধ্যেও কোন্ ছিদ্রপথে কি জানি কেমন করিয়া নবীন জীবনের হাওয়া প্রবেশ করিয়াছিল। নানা ঘটনা-বিপর্য্যয় আমাকে বর্ত্তমানকালের এই নবীন জীবনের প্রবর্ত্তক পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের পদপ্রান্তে আনিয়া ফেলিয়াছিল। শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের স্বাধীন স্বতন্ত্র উজ্জ্বল জীবনদর্শনকে বুঝিতে পারিলাম তাঁহার জীবন ও দর্শন-ব্যাখ্যাতা শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের নিকট।

নিজের জীবনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান কালের নারীর জীবনের যেদিক ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার অপর দিক দেখিতে পাইলাম বর্ত্তমান সময়ের নারীপ্রগতির মধ্যে। নিজের বুকভরা বেদনা দিয়া ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। স্বামীজীর নিকট জীবনের সমগ্রতার, জীবনের গতি ও স্থিতি উভয় দিক সমন্বিত যে পরিপূর্ণতার খোঁজ পাইয়াছিলাম, তাহারই আলোকে বুঝিতে পারিলাম জীবনের স্থিতিভূমি হারাইয়া ফেলিয়া বর্ত্তমান নারীপ্রগতি কি অন্ধকারের মধ্যে ছুটিতে চাহিতেছে। নারীপ্রগতির কারণ কি, এবং কোথায় কিভাবে নারী তাহার স্বতন্ত্র স্বাধিকার লইয়া সমকক্ষতার দাবিকে সার্থক করিতে পারে, জীবনের একত্ব ও বহুত্বের আস্বাদনকে মিটাইয়াই সুস্থ সমাজজীবন যাপন করিতে পারে, পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের প্রবর্ত্তিত সমগ্র জীবনের আলোকে তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছি। সমগ্র জীবনের এই দৃষ্টিভঙ্গী বর্ত্তমানের স্বাতন্ত্র্য, ও স্বাধীনতাকামী হৃতগৌরবা পথহারা মেয়েদের পথের খোঁজ দিবে। এই আশা লইয়াই স্কুলকলেজের কোন শিক্ষা না থাকিলেও জীবনের এই শেষের দিনগুলিতে এই বই লিখিবার দুঃসাহস করিয়াছি। পুরুষোত্তম শ্রীনিত্য-গোপাল এই প্রগতিকে জয়যুক্ত করুন।

নরনারায়ণ আশ্রম
৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা
শ্রীনিত্যগোপালদেবের
শুভ-আবির্ভাব-তিথি
বাসন্তী অষ্টমী, ১৬ই চৈত্র, ১৩৫৩।

প্রতিভা রায়

—প্রকৃতিহননকারী যে ভারতবর্ষ নারীকে ব্রহ্মলাভ সাধনার একান্ত প্রতিবন্ধক করিয়া রাখিয়াছিল, সেই ভারতবর্ষের মঠের সুদীর্ঘ কালের বদ্ধ দুয়ার যিনি ভারতের নারী সমাজের কাছে উন্মোচন করিয়া পরিপূর্ণ জীবনের ক্ষেত্রে নারীকেও সাদর আহ্বান জানাইলেন, সেই পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল দেবের—যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের—শ্রীচরণতলে এই "নারীপ্রগতির জন্মকথা" সমর্পণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ করিলাম।—

নারীপ্রগতির জন্মকথা

বাল্যকালের দুই বন্ধু। বাল্যজীবনে উভয়ের প্রতি উভয়ের ছিল প্রগাঢ় প্রীতি। ঘটনার আবর্তে পড়িয়া বহুদিন দুইজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। দীর্ঘদিন পরে আজ তাহারা আবার একত্রিত হইয়াছে। অনেকদিন পর দেখা হওয়ায় বাল্যের সেই প্রীতি উভয়ের হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের একটির নাম স্মৃতি এবং অপরটির নাম শ্রুতি। স্মৃতির বিবাহিত জীবন, সে চলিয়াছে সামাজিক বিধিনিষেধ মানিয়া। শ্রুতি অবিবাহিতা, বর্ত্তমান সমাজের বাঁধন ছেঁড়া। দুই বন্ধুর জীবনধারা যদিও চলিয়াছে দুই পথে, তবুও বাল্যের সেই প্রগাঢ় প্রীতিতে কাল ক্ষয় ধরাইতে পারে নাই। চলার পথ দুই জনের পৃথক হইলেও কোথাও উহাদের গভীর ঐক্য ছিল। তাই দীর্ঘদিনের ব্যবধান অন্তরের ব্যবধানে পরিণত হয় নাই।

স্মৃতি বলিল—ভাই শ্রুতি, অনেকদিন পর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইল। সেই বাল্যকালে আমরা কত খেলাই না খেলিতাম, দুইজনে ভাবও ছিল খুব। কিন্তু ভাই তবু যেন তোমার সহিত আমার কোথায় অমিল ছিল। তখন বয়স ছিল অল্প, নিজকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারিতাম না, তাই বুঝিতে পারি নাই, আমাদের অমিলটা ছিল কোথায়। এখনই কি আর কিছু বুঝি? মনের ভিতর কত যে পরস্পর-বিরোধী ভাব আসিয়া দ্বন্দ্ব বাধায়, তাহার মীমাংসা কিছুই খুঁজিয়া পাই না।

শ্রুতি হাসিয়া বলিল—কিসের দ্বন্দ্ব মনে উঠে ভাই, বল না?

স্মৃতি—বলিবই তো, অনেকদিন হইতে প্রাণের ভিতর তোমাকে চাহিতেছি। মনে ভাবি তুমি কোথায়। শুনিয়াছিলাম তুমি নাকি কোনও মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়া বিশ্ব সেবার জন্য নূতন যুগের পুরুষোত্তম-যোগ-দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছ। সেই হইতেই মনে হয় তোমাকে একবার নিকটে পাইলে প্রাণের সকল কথা বলিতাম। তোমাকে যখন আজ আমি পাইয়াছি, আমার জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর তোমার নিকট শুনিব।

শ্রুতি—সে তো খুব ভাল কথা ভাই। আমাদের দেশের মেয়েরা যেন একেবারে পুতুলের মত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের জীবনে যেন কোন সাড়া নাই, তাহাদের জীবনে যেন কোন প্রশ্ন নাই। সমাজের এত লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া চলিয়া, এত পরাধীনতার পাশে বদ্ধ থাকিয়াও তাহাদের জীবনে আত্মজিজ্ঞাসু ভাব, নিজকে ও বর্ত্তমান যুগকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মত মনোভাব বা আত্মচৈতন্য আসিতেছে না। তাহারা অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াই জীবনকে সার্থক করিতে চাহিতেছে, বর্ত্তমানের দাবী তাহাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর। আমার তো ভাই সেইজন্যই দুঃখ। এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার অমিল ছিল। আমি অতীত কিম্বা বর্ত্তমান কাহাকেও একান্ত করিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমি বুঝি জীবনের কথা, আমি বুঝি বিশ্বের কল্যাণের কথা। জগতের দিকে কি ভাই, একবার তাকাইয়া দেখিতেছ? আজ আমরা কোথায়? হৃদয়ের এই বেদনাতেই পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, আত্মীয়স্বজন সকলের সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাণকে ব্যথা দিয়া, চোখের জল সম্বল করিয়া পথে দাঁড়াইয়াছি; বিবাহিত জীবন যাপন না করিয়া মহাপুরুষের আশ্রিতা হইয়াছি এবং তাঁহার শ্রীচরণতলে বসিয়া এই যুগ-সমস্যার সমাধান কোথায় তাহাই খুঁজিতেছি। তাঁহার

নিকট সমস্ত দর্শনশাস্ত্র-মন্থন-করা অমৃতময়ী বাণী আমি যতই শুনিতেছি, ততই আমার সমস্ত দেহ মন প্রাণ এক মুক্তির আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি একদিকে যেমন মুগ্ধ, আশার আলোকে যেমন বুক আমার ভরিয়া উঠে, অপরদিকে মানুষের অচল নিস্তব্ধ ভাব দেখিয়া ভয়ে হতাশায় বুক আবার ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। বল না ভাই স্মৃতি, চারিদিকের এই নিস্তরঙ্গ অবস্থার মাঝে তোমার বুকে কিসের তরঙ্গ উঠিয়াছে?

স্মৃতি—তোমাকে তো সে কথা বলিবই; তোমাকে সে সকল কথা বলিবার জন্য প্রাণ আমার ব্যাকুল। আচ্ছা, সেই মহাপুরুষের নিকট কি তুমি অতীত যুগের ও বর্ত্তমান যুগের সমন্বয়ে যে জীবন, সেই জীবনের সন্ধান পাইয়াছ?

শ্রুতি—তাঁহার জীবনই যে ভাই সমন্বয়ঘন; সেইজন্যই তাঁহার ভিতর দিয়া এই সর্ব্বসমন্বয়ঘন পুরুষোত্তম দর্শনশাস্ত্র স্ফুরিত হইতেছে। এই দর্শনশাস্ত্রই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ব সমস্যার সমাধান করিবে। তাঁহার জীবনের আলোর স্পর্শেই আজ সমাজের এই বীভৎস মরণের চিত্র এত পরিস্ফুট হইয়া আমার নিকট ধরা দিয়াছে। চোখের সামনে সমাজের এই ধ্বংসোন্মুখ চিত্র প্রাণটাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। ধ্বংসোন্মুখ এই সমাজকে রক্ষা করিবার কৌশল তাঁহার জীবন ও তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যার ভিতর রহিয়াছে। কিন্তু কেমন করিয়া যে সমাজের বুকে এই কৌশল-বীজ ছড়াইয়া পড়িয়া মানুষকে কল্যাণের পথ, শান্তির পথ, বাঁচিবার পথ দেখাইবে, তাহাই ভাবি। মানুষ যে কত অসহায়, তাহা তো সে বুঝিয়াও বোঝে না। অতীতের চিন্তাধারার খুঁটায় বাঁধা মন তাহাদের; বর্ত্তমানের টানে অতীতের খুঁটা গিয়াছে উপড়াইয়া, কিন্তু অতীতের দড়ি তো গলাতেই রহিয়াছে। মানুষ পড়িয়াছে মুস্কিলে; অতীতও গিয়াছে তাহার আল্‌গা হইয়া, বর্ত্তমানকেও সে লইতে

পারিতেছে না, কেননা বর্ত্তমান যুগের চলার দর্শন সে আজও পায় নাই। অতীত বলে—আমি একান্ত অতীতই থাকিব; বর্ত্তমান বলে—আমি একান্ত বর্ত্তমানই হইব। উভয়ে উভয়কে অস্বীকার করিয়া চলিতে চায় বলিয়াই যত গোলমাল। উভয়কে যদি উভয়ে স্বীকার করিয়া লইয়া চলিতে পারিত, তাহা হইলে সমস্যা মিটিয়া যাইত। পরস্পর পরস্পরকে স্বীকার করিয়াই শুধু সত্য বাস্তব হইতে পারে; নতুবা অর্দ্ধ-সত্যের মধ্যে অপর অর্দ্ধ লুকাইয়া থাকিয়া তাহার বাস্তবতাকে একদিন ব্যর্থ করিয়া দিবেই। অতীতের বুকের ভিতর দিয়াই বর্ত্তমানের সৃষ্টি, অতীতের অভিজ্ঞতার ফলই বর্ত্তমান; তাহা হইলেও তাহার একটা স্বতন্ত্র মূল্য রহিয়াছে। এ জগতে সকলই স্বরম্; কাহাকেও অস্বীকার করিলেও কেহ অস্বীকৃত হইবে না। অতীত অতীত থাকিবেই, বর্ত্তমানও বর্ত্তমান থাকিবে; চাই শুধু দুইয়ের মিলনকৌশল জানিয়া সেই ঢংএ বিশ্বকে গড়িয়া তোলা, সেই ছন্দে জীবনপথে চলা। এই দুইয়ের উপরের যে শাস্ত্র এবং মানুষ—তাঁহারাই দিবেন ইহার মীমাংসা। এইজন্যই আমার যিনি আচার্য্য, তিনি উৎ-আসীন হইবার কথা, উপরের স্তরে উঠিবার কথা খুব বলেন। তাই তো ভাবি স্মৃতি, কেমন করিয়া এই দীর্ঘদিনের চিন্তাধারা, যাহা মানুষের ভিতর শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, তাহাকে বদলাইয়া দেওয়া যায়। আচ্ছা, তোমার কথা বল শুনি।

স্মৃতি—তোমার কথা শুনিয়া আমার মনে হইতেছে, অতীত ও বর্ত্তমানের দ্বন্দ্বই বুঝি আমার জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে। ভাল মেয়ে, ভাল বৌ তো হইয়াছি; কিন্তু প্রাণ যেন ইহাতেও তৃপ্ত নয়; সে যেন কোথায় নিজকে অসহায় ও অপমানিত বোধ করে। মন যেন কেমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চায়। ইহার কারণ কি, বল তো ভাই?

শ্রুতি—তোমার ভিতর যে ভাল মেয়ে, ভাল বৌ সাজিবার প্রচেষ্টা,

উহা অতীতের সংস্কার। অতীতের মেয়েরা শুধু ভাল হইতেই চাহিয়াছে। স্বামী তাহাদের যত অযোগ্য, অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য, অসচ্চরিত্র বা অত্যাচারীই হউক না কেন, পতিব্রতা স্ত্রী বিনা বিচারে সেই স্বামীকে দেবতাবুদ্ধিতে সেবা করিয়াই যাইবে; স্বামী যত অযৌক্তিক, অসঙ্গত কথাই বলুক না কেন, পতিব্রতা নারী পতির আজ্ঞা পালনের জন্য নির্ব্বিবাদে তাহা পালন করিবে—ইহাই হইল অতীতের ভাল মেয়ে, ভাল বৌদের সতীত্বের মাপকাঠি। অতীতের এই সতীত্বের একটী গল্প আছে। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুষ্ঠ ব্যাধিতে পঙ্গু, চলচ্ছক্তিহীন। একদিন তাহার নগরের লক্ষহীরানাম্নী বারবনিতার নিকট যাইবার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছার কথাও তাহার স্ত্রীকে সে জানাইল। তাহার পতিব্রতা স্ত্রী তখন পতির এই অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে উক্ত বারবনিতার চিত্ত আকৃষ্ট করিতে প্রতিদিন রাত্রিশেষে যাইয়া ঐ বারবনিতার উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া আসিত। কয়েকদিন এইরূপ করার পর একদিন লক্ষহীরার দৃষ্টি উক্ত ব্রাহ্মণ-পত্নীর উপর পড়িল। সে তাহার এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ-পত্নী অতি বিনয়সহকারে তাহার কুষ্ঠব্যাধিতে পঙ্গু স্বামীর অভিলাষ তাহাকে জানাইল। লক্ষহীরা সেই কথা শুনিয়া তাহার স্বামীকে লইয়া আসিবার জন্য বলিয়া দিল। পতিব্রতা ব্রাহ্মণ-পত্নী তখন পঙ্গু স্বামীকে কোলে করিয়া লক্ষহীরা বারবনিতার গৃহে লইয়া আসিল—ইহাই হইল অতীতের পতিব্রতার আদর্শ। তাহাদের জীবনে কোন বিচার ছিল না। মেয়েদের জীবনের বিচারের প্রসঙ্গই ভাগবতে উঠিয়াছে। যেদিন পূর্ণিমা রজনীতে বংশী-নিনাদ করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীকুলকে ঘরছাড়া করিয়া যমুনার তীরে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন, সেইদিন তিনি উপদেশের ছলে, পরিহাস করিয়া কি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতই না গোপীগণকে করিয়াছিলেন!

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া ।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ॥
দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা ।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥ ভাগবত

হে কল্যাণীগণ, প্রাণ খুলিয়া ভর্ত্তার শুশ্রূষা এবং তাহার বন্ধুদের ও প্রজাদির অনুপোষণই স্ত্রীলোকদের পরধর্ম্ম। দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, রোগী এবং অধন অপাতকী পতিকে মোক্ষাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রী কখনও ত্যাগ করিবেন না।

শ্রীকৃষ্ণ ঘরের বাহিরে গোপীদের টানিয়া আনিয়া পুনরায় এইরূপ উপদেশ দেওয়ায় ইহা বেশ বুঝাইতেছে যে, দুঃশীল দুর্ভগ স্বামী লইয়া পতিব্রতা হওয়ার পরধর্ম্ম (?) তিনি সমর্থন করেন না। তিনি প্রত্যক্ষে ঘরে ফিরিবার কথা বলিলেও পরোক্ষে উহার ব্যর্থতার ইঙ্গিতই করিয়াছিলেন। তিনি যদি উহা সমর্থনই করিতেন, তাহা হইলে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীদের মত ব্রজগোপীগণকেও বুঝাইয়া ঘরে পাঠাইতে পারিতেন এবং ব্রজগোপীগণও তাঁহার কথা শুনিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতেন। তাহা না করায় ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উপহাস করিয়াই ব্রজগোপীদের তিনি ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, রোগী ও অধন, অপাতকী (?) পতির দল নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি "স্বামিত্বের" সাদা চেক সহি করিয়া নারীর উপর অবাধ লুণ্ঠন চালাইতেছে—এই ইঙ্গিতই সেদিন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া বিশ্বের নারীকুলকে দিয়া গিয়াছেন। দুঃশীলতা, দুর্ভাগ্য, বার্দ্ধক্য, জড়ত্ব, রোগিত্ব ও নির্ধনতা এতদিন স্বামীদের পক্ষে "পাতক" বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। স্বামী হইলেই হইল; সব মহাপাতকও তখন অপাতক। শ্রীকৃষ্ণ দুঃশীলতা প্রভৃতিকে স্বামীর পক্ষে "পাতক" বলিয়াই মনে করেন। "অপাতকী" শব্দ ভাগবতে শ্লেষার্থেই প্রযুক্ত

হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই ধাক্কাই অতীত জীবনের সহিত বর্ত্তমানের এই দ্বন্দ্ব বাধাইয়াছে। একজন ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত কিম্বা একজন ক্লীব পতির সহিত ১০।১২ বৎসরের মেয়ের বিবাহ দিয়া সমাজপতির দল সেই স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবার উপদেশ দান করিয়া উক্ত মেয়েটীকে স্বামীর ঘর করিতে পাঠাইয়া দেয়। তখন সেই মেয়েটী তাহার জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চাপিয়া রাখিয়া স্বামীর ঘর করিতে থাকে। সেখানে তাহার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন প্রশ্ন নাই ; আছে শুধু ভাল মেয়ে, ভাল বৌ হইবার নীতি। প্রাণ কি তাহা মানিতে পারে ? প্রাণবান্ মানুষ বলিবে—আমিও তো মানুষ, মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার আমারও আছে। এত অবিচার প্রাণ সহ্য করিতে পারে না। প্রাণের রহিয়াছে অধিকারের দাবী। বর্ত্তমান কালে প্রাণ তাহার দাবী বিশ্বদরবারে উপস্থিত করিয়াছে। আমি নারীজাতি বলিয়া আমার কোন অধিকার নাই—একথা আর শুনিব না। নারী-জীবনেও আশা-আকাঙ্ক্ষা, মান-মর্য্যাদা সমস্তই রহিয়াছে। নারী-জীবনের সকল বৃত্তিগুলিকে স্বাধীনভাবে স্ফুরিত হইতে দিতে হইবে এবং তাহার মান-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাকে সমাজে চলিবার অধিকার দিতে হইবে। ইহাই বর্ত্তমানের প্রাণের সমকক্ষতার দাবী, যাহার জন্য ভাল বৌ, ভাল মেয়ে হইয়াও তোমার প্রাণ তৃপ্ত নয়, সে বিদ্রোহ করিতে চায়। প্রাণের দাবীর ধাক্কায়, অতীতের বিচারহীন সতীত্ব আর চলিতেছে না, চলিবেও না।

স্মৃতি—আচ্ছা ভাই, দেখিতেছি তো স্বামী ও অন্যান্যরা আদরও করেন, খানিকটা স্বাধীনভাবে চলাফেরাও করি ; খুব একটা অসম্মান, পরাধীনতার কথা বিশেষ বুঝিতেও পারি না। কিন্তু তবুও প্রাণের ভিতর নিজকে অসহায়, অপমানিত বোধ করি কেন ? আর এই যে অতীতের ভাল মেয়ে, ভাল বৌ হইয়া বিচারশূন্য অবস্থায় সকল অবিচারকে মানিয়া

লইবার মত মনোবৃত্তি—এ মনোবৃত্তিই বা নারীজীবনে কোন্ স্থান হইতে কেমন করিয়া শিকড় গাড়িল?

শ্রুতি—এদেশে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রবর্ত্তন হওয়ায় বাহিরের দিক দিয়া একটা চাপাচাপির ভাব কমিয়া গিয়াছে, অবশ্য তাহাও সহর জীবনে। পল্লীর অন্তরালে বহু সংস্কার এখনও লুকাইয়া আছে। বর্ত্তমানে বাহিরে অনেকটা স্বাতন্ত্র্যলাভ মেয়েদের হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যে চিন্তাধারার উপর সমাজ গঠিত, তাহার কোন পরিবর্ত্তন না হওয়ায় বাহিরে তোমাকে সংসার যতই আদর দেখাক না কেন, তুমি সংসারের নিকট ভোগ্যরূপেই শোষিত হইতেছ। যত কিছু ভাল উপাধি দিয়া তোমাকে সবাই শোষণ করিতেছে; কিন্তু তোমার ভিতর যে তোমার নিজস্ব স্বাধীন সত্তা রহিয়াছে, সে তাহার সম্মান না পাইয়া, নিজকে শোষিত হইতে দেখিয়া, নিজকে অপমানিতই বোধ করিতেছে। বর্ত্তমানে মেয়েরা যে স্বাধীনতা বা শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে তাহাদের নিজস্ব গৌরবমণ্ডিত যে স্বাতন্ত্র্যবোধ, তাহা জাগ্রত হয় নাই। তাহার কারণ তাহাদের স্বাধীনতা, তাহাদের শিক্ষা তাহাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাধারা স্ফুরিত করিতে পারে নাই। অতীতের চিন্তাধারার ফলে আজও মেয়েরা মনে করে, পুরুষ ছাড়া তাহাদের চলার উপায়ই নাই, পুরুষেরাও মনে করে তাহাদের বাদ দিয়া মেয়েরা চলিতেই পারে না; অথচ মেয়েদের বাদ দিয়া তাহাদের চলায় কোন ব্যাঘাতই হয় না। এই অসমকক্ষতার ফলেই মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য নাই, তাহারা পুরুষের দাসী মাত্র। বাহিরে একটা স্বাতন্ত্র্যের মত আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু ভিতরে প্রত্যেক নারীই একান্তভাবে পুরুষের অধীন। এই মনোবৃত্তি, এই চিন্তাধারা তাহাদের ভিতর রহিয়াই গিয়াছে। সে এমন গোপনভাবে মানুষের রক্ত মাংসের ভিতর লুকাইয়া আছে যে মানুষ তাহা ধরিতেও পারে না। আমরা বহুদিন মনে করিয়াছি বৃটিশের রাজ্যে আমাদের কিসের

অভাব? আমরা তো বেশ স্বাধীনভাবেই বাস করিতেছি; কিন্তু কোন্ অলক্ষ্যে যে আমাদের বল-বীর্য্য-ধন-মান সমস্ত শোষিত হইয়া যাইতেছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের অভাব হইয়াছে আমাদের স্বাধীন প্রকৃত "আমি"র। মেয়েরাও এইরূপ স্বাধীনতাই পাইয়াছে। চিন্তাধারার ভিতর দিয়া কোথায় যে তাহারা ছোট হইয়া রহিয়াছে বা পুরুষেরা ছোট করিয়া রাখিয়াছে, তাহা পুরুষ কিম্বা নারী কেহই বুঝিতে পারিতেছে না। শাস্ত্রের এক খোঁচায় মেয়েরা ন স্যাৎ হইয়া গিয়াছে। এই অসমকক্ষতার গ্লানিই আজ বহু নারীর জীবনে সাড়া আনিয়াছে; তোমার ভিতরেও সেই সাড়াই জাগিয়া উঠিতে চাহিতেছে। সেইজন্য তোমার প্রাণ শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চায়। ইহাই তো ভাই, বর্ত্তমান বিকৃত সমাজের গোড়ার কথা। যেদিন হইতে সমাজে এই শোষণ নীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে, সেইদিন হইতেই সমাজ বিকৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ সকল ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এই শোষণ নীতি। স্বামী-স্ত্রীতে, নর-নারীতে, রাজা-প্রজায়, গুরু-শিষ্যে, ধনিক-শ্রমিকে সর্ব্বত্র চলিয়াছে শোষণ। এই শোষণের জন্যই প্রকৃতির সকল স্তরে, সকল ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ঘনীভূত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। এই ব্যাপক সমস্যা ও তাহার সমাধানই পুরুষোত্তমদর্শনের ভিতর পাইতেছি।

আজ পর্য্যন্তও নারী নরকের দ্বার, দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত। দুঃখ হয় স্মৃতি, এই সকল উপাধির অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়াও নারীজাতি বেশ আরামে, আনন্দে দিন কাটাইতেছে। পুরুষ কতকগুলি বস্ত্র অলঙ্কারের প্রলোভন দেখাইয়া প্রতিদিন তাহার আত্মাকে অপমানিত করিতেছে; সেদিকে কি মেয়েদের দৃষ্টি আছে? সমাজব্যবস্থার গোড়াতেই মেয়েদের ছোট করিয়া রাখা হইয়াছে। সেইজন্যই মেয়েদের পুরুষ ছাড়া চলার উপায় নাই—এই বোধ প্রত্যেক পুরুষের এবং প্রত্যেক মেয়ের মনোভাবের ভিতর বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

কোনও ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ব্রাহ্মণী নহেন; নারায়ণপূজা ব্রাহ্মণ করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণীর নারায়ণকে ছুঁইবার অধিকার পর্য্যন্ত নাই। নারায়ণ হইলেন পুরুষদের নির্ম্মল লোকের দেবতা; শেষে স্ত্রীলোকের স্পর্শে যদি অপবিত্র হন! ব্রাহ্মণেরা আহার করিতে বসিলে ব্রাহ্মণীরা যদি ব্রাহ্মণকে সেই সময় স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আহার নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু গ্রীষ্মের রৌদ্রে আগুণে পুড়িয়া, ঘামে ভিজিয়া রান্না করার বেলায় প্রয়োজন আছে ব্রাহ্মণীর। প্রণব গ্রহণে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই, তাই কুলগুরুগণ মেয়েদের মন্ত্র দিবার বেলায় প্রণব ও স্বাহা শব্দ ব্যবহার করেন না। এমনই করিয়া কত নিয়মনিষেধের বেড়া দিয়া নারী জাতিটাকে ছোট করিয়া, পঙ্গু করিয়া দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরুষদিগের পদস্খলনে কোন দোষ নাই, নারীর সামান্য পদস্খলনও সমাজে অমার্জ্জনীয়। প্রকৃতি স্বভাবতঃই হেয়া, দুষ্টা কিনা! সমাজ তাই তাহাকে নানা প্রকারের শাসনের ভিতর রাখিয়াছে। মেয়ে একটু বড় হইলেই বিপদ; তাহাকে একটা পুরুষের হাতে রক্ষার জন্য দিতেই হইবে। মেয়েরা স্মৃতির ব্যবস্থায় পণ্য দ্রব্যে পরিণত। সমাজে তাহাদের সম্মান নাই কোথাও। এই অপমানবোধ তাহাদের নাই বলিয়াই মিথ্যা ভাল-র আবরণে সে প্রতিদিন শোষিত হইতেছে; আত্মা তার প্রতিনিয়ত অপমানিত হইয়া আজ বিদ্রোহের রূপ ধারণ করিয়াছে। তোমার মনের ভিতর যে অপমানবোধ ও বিদ্রোহের সাড়া পাও, তাহার নিগূঢ় কারণও ইহাই। কিন্তু বিদ্রোহে তো ইহার মীমাংসা হইবে না; চাই জীবনকে বিপ্লবের মাঝে ফেলিয়া দেওয়া। সকল প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে অভিযানের আদর্শমূর্ত্তি বিপ্লবময়ী শ্রীরাধাপ্রকৃতি।

স্মৃতি—আচ্ছা, নারী-পুরুষের মধ্যের এই অসমকক্ষতার মূল কোথায়? বিশিষ্ট মহাপুরুষেরাও তো ভগবানকে পাইতে হইলে কামিনী-কাঞ্চন

ত্যাগের কথাই বলিয়াছেন। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কোথা হইতে নারী-জাতির উপর এই হেয়ত্ব আরোপিত হইল, কেন হইল, এবং সত্যই নারী এত হেয় কিনা। তোমাদের পুরুষোত্তমদর্শন ইহার সম্বন্ধে কি বলিতেছে?

শ্রুতি—নারী-পুরুষের এই অসমকক্ষতার মূল আমাদের শাস্ত্রের ভিতরই রহিয়া গিয়াছে। যুগে যুগে শাস্ত্রের ভিত্তির উপরেই গড়ে সমাজ। বর্ত্তমানে আমরা সমাজের যে কাঠামোর মধ্যে বাস করিতেছি, তাহার মূলও শাস্ত্রের মধ্যেই নিহিত। পাতঞ্জলদর্শন দ্রষ্টা পুরুষ এবং দৃশ্যা প্রকৃতির সংযোগটাকেই হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, দ্রষ্টাকে ঐ দার্শনিকগণ জ্ঞানময় নির্ম্মল পুরুষরূপে দাঁড় করাইয়াছেন এবং ঘটনাবহুল দৃশ্যা প্রকৃতিকে তাঁহারা মলিনা, হেয়া বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। এই মলিনা, হেয়া দৃশ্যার সহিত যখনই নির্ম্মল দ্রষ্টার সংযোগ হয়, তখনই নির্ম্মল দ্রষ্টা মলিন, হেয় হইয়া যায়। কেমন করিয়া কবে যে এই মলিনা দৃশ্যের সহিত নির্ম্মল দ্রষ্টার সংযোগ হইয়াছে, তাহা তাঁহারা জানেন না। এখন এই নির্ম্মল দ্রষ্টাকে নির্ম্মল হইতে হইলে, মলিনা দৃশ্যের সংযোগ হইতে তাহার মুক্ত হইতে হইবে। এই দর্শনকে ভিত্তি করিয়াই নারী জাতির উপর এই প্রকার হেয়ত্ব আরোপ করা হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রে পুরুষ-প্রকৃতিতে যে তাত্ত্বিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, বাস্তব জগতের নরনারীসম্বন্ধও সেই আলোকে নির্ণীত হইয়াছে। সেইজন্যই এই বাস্তব জগতের পুরুষ দ্রষ্টা ও ভোক্তা, নারী দৃশ্যা ও ভোগ্যা। পুরুষোত্তমদর্শন বলিবে—দ্রষ্টা যদি এত নির্ম্মলই, তাহা হইলে দৃশ্যের মলিনতা তাহাকে স্পর্শ করিল কেমন করিয়া? নির্ম্মল দ্রষ্টার যখন মলিনা দৃশ্যের সহিত সংযোগ হইতেছে, তখন নির্ম্মল দ্রষ্টার ভিতরও এমন একটা কিছু প্রবণতা নিশ্চয়ই আছে যাহার ফলে দৃশ্যের মলিনতা তাহাতে সংক্রামিত হইতে পারিয়াছে।

ঐ প্রবণতা নিশ্চয়ই নির্ম্মলতা নহে। যেমন রোগের বীজাণু—বীজাণু কি সকলের ভিতরেই প্রবেশ করিতে পারে? যাহার ভিতরে বীজাণুকে গ্রহণ করিবার মত প্রবণতা থাকে, তাহার ভিতরেই সেই রোগের বীজাণু প্রবেশ করিতে পারে। নির্ম্মল দ্রষ্টার ভিতরেও মলিনা দৃশ্যের সহিত মিলিবার মত প্রবণতা একটা ছিল বলিয়াই এ মিলন সম্ভব হইয়াছে। দ্রষ্টাকে যেভাবে উঁহারা নির্ম্মলরূপে দাঁড় করাইয়াছেন, স্বরূপতঃ দ্রষ্টা সেভাবে নির্ম্মল নয়। কেমন করিয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মিলন মলিন না হইয়া নির্ম্মল হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার এবং বিশ্বকে সেই কৌশল শিখাইবার জন্যই বৃন্দাবনে নবীন মদন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মদনমোহন লীলা। তাঁহাদের জীবনে বিশ্ব দেখিয়াছে দ্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্যা প্রকৃতি কেমন করিয়া, কোন্ যুক্তিতে উভয়ে পৃথক, সমকক্ষ ও অদ্বৈত হইয়া নির্ম্মল সংযোগে সংযুক্ত হইতে পারে। নারী যে নরকের দ্বার নয়, সেও যে ব্রহ্মময়ীরূপে ফুটিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত পরাপ্রকৃতি রাধারাণী। যে কৌশলে অপরা নারী প্রকৃতি নরকের দ্বার না হইয়া ব্রহ্মময়ী পরা প্রকৃতি হইতে পারে, আমাদের সমাজ-কাঠামো গড়িবার সময় আমাদের সমাজ প্রবর্ত্তকগণ সে কৌশলের আশ্রয় লন নাই। নিজেদের দুর্ব্বলতা অর্থাৎ প্রকৃতিকে হজম করিয়া পরা প্রকৃতিরূপে গড়িয়া তুলিবার যোগ্যতা না-থাকা রূপ দুর্ব্বলতাকে পুরুষ নানা প্রকারে প্রকৃতির ঘাড়ে চাপাইয়া তাহাদিগকে সমাজে হেয় করিয়া তুলিয়াছে এবং নিজদিগকে নির্ম্মল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপ্রথমে নারীজীবনের উপর হইতে এই চাপ সরাইয়া তাহাদের ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তি জগতের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব বলিয়াছিলেন যে, বৃন্দাবনের রাসলীলা শ্রবণ করিলে জীবের কাম দূরীভূত হইয়া যাইবে। নারী-পুরুষের কাম কামরূপে থাকিবে অথচ তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইবে না, তাহাদের সেই কাম বিশ্বকে

ধ্বংস করিবে না, সে কাম মুক্তিপথের বাধা হইবে না, সে কাম হইবে বিশ্ব-সেবার উপাদান, সে কামে গড়িয়া উঠিবে উজ্জ্বল বিশ্ব। পুরুষোত্তমদর্শনে পুরুষ-প্রকৃতির এই নির্ম্মল অনবদ্য সংযোগের কথাই রহিয়াছে।

স্মৃতি—কাম তো একটা রিপু; কামত্যাগের কথা সেইজন্য সবাই বলিয়াছেন। কামকে কাম রাখিয়া সংসারে নারী-পুরুষ মিলিয়া চলিতে গেলে উচ্ছৃঙ্খলতা তো আসিবেই। তুমি বলিতেছ নারী-পুরুষের কাম কামরূপে থাকিবে, অথচ উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিবে না,—ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

শ্রুতি—কাম ব্যক্তিগত জীবনে রিপুই বটে; এই কামকে ত্যাগ করিতেই হয়। কিন্তু পরিত্যাগের যে পথ ইঁহারা লইয়াছেন, ঐ পথে কাম ত্যাগ হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। অস্বাভাবিক রূপে কামকে দমন করিতে গেলে আঘাতের পর আঘাত খাইয়া কাম দেহ-যন্ত্রকে বিকল করিয়া দিবে; ফলে আসিবে জীবনে অবসাদ, আসিবে জীবনে ক্লীবত্ব। কামকে যে দমন করিবে, তাহাকে চিনিবে কিরূপে, কাম তো অনঙ্গ। শিবের মদন-ভস্মের কথা শুনিয়াছ তো? শিব যখন মদনকে ভস্ম করিলেন, তখন মদন হইলেন অনঙ্গ অর্থাৎ যাহার অঙ্গ নাই। অঙ্গহীন কাম বিশ্বের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে; অঙ্গ থাকিলেও না হয় মানুষ তাহাকে চিনিতে পারিত, ধরিতে পারিত। এখন কাম অঙ্গহীন, তাহাকে আর ধরাই যাইবে না। কাম যদি কল্যাণের রূপে আসে, তখন তাহাকে চিনিবার মত বুদ্ধি কি মানুষের আছে? শত্রু অনেক সময় মিত্ররূপে আসে; অজ্ঞান-অন্ধকারে যে মানুষ রহিয়াছে, সে তাহা বুঝিবে কিরূপে? মহীরাবণ যখন রাম-লক্ষ্মণকে হরণ করিতে বিভীষণের রূপ ধরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন রামভক্ত হনুমানও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সাধারণ মানুষের বুঝিবার তো সাধ্যই নাই।

কামকে রিপুবুদ্ধিতে বাহির হইতে যতই চাপ দিবে, সে গোপন পথে ততই জীবনকে আক্রমণ করিবে। তাই না ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন—"নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি"? নিগ্রহ করিয়া কাম দমন করা যায় না। কাম তো কেবল ইন্দ্রিয়বিশেষের মধ্যেই নাই; কাম রহিয়াছে বিশ্বে সব কিছুর মধ্যে ছড়াইয়া। কামনাই কাম; নিজের তৃপ্তির জন্য ভোগ করিবার যে দুর্ব্বার বাসনা, তাহাই কাম। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম"। এই বিশ্বকে যখনই নিজের আত্মা হইতে পৃথক করিয়া রাখিলে, তখনই কাম বিকৃতরূপে তোমাকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিবে। যেদিন ব্যক্তিগত জীবন হইতে পরিবারজীবন, সমাজজীবন, জাতীয় জীবন ও বিশ্বজীবনকে মানুষ বাদ দিল, সেই দিন হইতেই কাম তাহাকে রিপুরূপে আত্মসাৎ করিল। কামদমনের পথ হইতেছে বিশ্বরূপ জীবন যাপন করা। বিশ্বরূপের ক্ষেত্রেই কাম দমন হয়। বিশ্বকে ব্যক্তিগত জীবন হইতে বাদ দিলেই কামদমনের প্রশ্ন উঠে; নতুবা যিনি বিশ্বকর্ম্মী, তাঁহাকে কাম আটকাইবে কোথায়? যাঁহাকে দিন রাত্রি পরিবারের ভাবনা, সমাজের ভাবনা, জাতির ভাবনা, বিশ্বের ভাবনা ভাবিতে হয়, তাঁহার কাম তাঁহাকে মোহিত করিবে কি করিয়া? একজন লিখিয়াছিলেন—"যীশুখৃষ্টের বিশ্বের সহিত বিবাহ হইয়াছিল"; তাই যিনি বিশ্বপ্রেমে পাগল, বিশ্বের সকলের সহিত একাত্ম ভাব হইয়াছে যাঁহার, বিশ্বের সকল রূপের সহিত যিনি যুক্ত, তাঁহার জীবনে ব্যাপক বিশ্বের কোন ঘটনাকেই তিনি বাদ দিয়া চলিতে পারেন না। বিশ্বসেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। এইরূপে বিশ্ব-রূপের সহিত মিলন হইয়াছে যাঁহার, তাঁহারই জীবনে কাম, কাম থাকিয়াও অকাম, সর্ব্বকাম ও মোক্ষকাম; কাম তখন রিপু নয়, কাম তখন যোগায় জীবনের প্রেরণা।

ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন। কি বিরাট্, কি বিশ্বরূপ

জীবন তাঁহার, যাঁহার জীবনে বিশ্বের সকলের সকল দাবী পূর্ণ হইয়াছিল! মদনমোহন তিনি, প্রতিক্ষণে তিনি নবীন মদন রূপে ছুটিয়া চলিয়াছেন। বৃন্দাবনে কি ছুটাছুটির লীলা তাঁহার! তিনি কখনও মা যশোদার কোলে, কখনও সখাদের সহিত গোচারণে, কখনও আবার ব্রজগোপী-গণের সহিত মধুর রসাস্বাদনে রত। কখনও পশুপক্ষীর নয়নানন্দ রূপে, কখনও মুনি ঋষিদের যোগেশ্বর রূপে, আবার কখনও পুতনাদির মুক্তিদাতা রূপে। তিনি কখনও নাবিক, কখনও কোটাল, কখনও নাপিত, কখনও মালাকার। আবার তিনিই কৃষ্ণকালী রূপে, তিনিই আবার সূর্য্য পূজার পুরোহিত রূপে। তিনি কখনও ব্রজগোপীর অঙ্গনে নৃত্যপরায়ণ বাল গোপাল, কখনও কালীয় নাগের মস্তকোপরি নৃত্য রত। আবার তিনি গোবর্দ্ধনধারী, পিতা নন্দের বাধা বহনকারী, মা যশোদা কর্ত্তৃক বন্ধন-কাতর, শ্রীরাধার চরণতলে মান ভিখারী। সেই কৃষ্ণই আবার অক্রুরের রথে মথুরার পথে ব্রজগোপীদের করুণ দৃশ্য দর্শনকারী। আবার তিনিই কংসের সভায় মৃত্যু রূপে, কুব্জার ঘরে কুব্জার মোহন রূপে। কি তাঁহার কর্ম্মজীবন! তিনি কখনও দ্বারকায়, কখনও ইন্দ্রপ্রস্থে, কখনও বা পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত বনে বনে, কখনও বিরাট রাজ্যে, কখনও হস্তিনায় পাণ্ডবের রাজ্য ভিক্ষার জন্য দূতরূপে। কখনও বিদুরের ঘরে খুদ গ্রহণ-কারী, কখনও বা জরাসন্ধের কারাগারে রাজগণের বন্ধন মুক্তিদাতা রূপে, কখনও সুভদ্রার অতিথি দণ্ডী রাজার জন্য পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধরত। আবার কুরুক্ষেত্রের রণে অর্জ্জুনের রথে তিনি সারথী, তিনিই আবার গীতার বক্তা। তাঁহার এই বিরাট্‌ বিশ্বরূপ দেখিয়া মদন স্তম্ভিত, মদন নিজেই মোহিত। এই পুরুষোত্তমজীবনলাভই হইল কাম-দমনের উপায়। এইরূপ ব্যাপক জীবন যাঁহারা যাপন করেন তাঁহাদের জীবনের চলার ছন্দ থাকে ঠিক। তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল হন না, অথচ তাঁহারা কোথাও একটা কিছুতে আট্‌কা পড়েন না। আট্‌কা পড়িলেই

জীবনের গতি হয় বন্ধ, ছন্দ যায় হারাইয়া। তখনই কাম মানুষকে বিপন্ন করে, উচ্ছৃঙ্খল সাজায়।

স্মৃতি—কামকে এতদিন রিপু এবং ঘৃণ্য বলায় মানুষের উহার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকিলেও উহা অনেকখানি দমিত থাকিত। কামের উপর হইতে চাপ সরাইয়া লইলে উহা কি সমাজ জীবনকে আরও উচ্ছৃঙ্খল করিবে না? এই সমস্যার ঠিক ঠিক সমাধান করিতে পারিতেছি না।

শ্রুতি—তুমি বলিতেছ পাপ ও ঘৃণ্য বলিয়া কামের উপর চাপ থাকায় কাম অনেকখানি দমিত থাকে, ইহা কি ঠিক কথা? যে জিনিষকে নিষেধ করা যায়, মানুষের ঝোঁক সেই জিনিষের উপরই পড়ে। নদীতে বাঁধ দিলেই, সেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য নদীর বেগ আরও বর্দ্ধিত হয়। বাড়ীর চারিটি ঘরের একটি ঘরে যাইতে নিষেধ করিলে সেই ঘরে যাইবার জন্যই কৌতূহল বেশী হয়, মন সর্ব্বদা সেই ঘরের তত্ত্ব জানিবার জন্য উক্ত ঘরের চিন্তায় পাগল হইয়া উঠে। সেইরূপ পাপের ভয় দেখাইয়া কাম হইতে মানুষকে দূরে রাখিবার চেষ্টায় মানুষ আজ কামের পথে দ্রুতগতিতে ধাবিত হইয়া অকালমৃত্যুর আশ্রয় লইতেছে। সমাজ উপর হইতে যতই কামকে চাপ দিয়াছে, কাম ভিতর হইতে সমাজ জীবনকে ততই ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে। যেমন বর্ত্তমানে গভর্ণ-মেণ্টের কণ্ট্রোল-ব্যবস্থা। মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনচলার পথে ব্যবহারিক জিনিষপত্রের উপর যতই আইনের চাপ পড়িতেছে, চোরা-বাজার ততই পুরাদমে বাড়িয়া চলিয়াছে। যে চাউলের দর ৩৷৪ টাকা মণ ছিল, তাহা যখন সরকারী আইনে ১৬৲ টাকা মণ হইয়া রেশন কার্ডের মারফতে চলিতে আরম্ভ করিল, তখনই ২০৲।২৫৲।৪০৲ টাকায় যে যে-দরে পারিল চোরা বাজারে বিক্রী করিতে আরম্ভ করিল। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে যখনই বাধা আসিবে, তখনই সে গোপন পথে বিকৃত রূপে জীবনকে ধ্বংস করিবে,—বিজ্ঞানের নিকট এ সত্য আজ ধরা

পড়িয়াছে। কামের উপর হইতে "কাম পাপ নয়" বলিয়া চাপ সরাইয়া দিলে সমাজজীবনকে কাম আরও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া দিবে বলিতেছ। আপাততঃ বাহিরের দৃষ্টিতে সে রূপ মনে হইতে পারে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যারামের ভিতরকার বীজকে নষ্ট করিবার জন্যই ব্যারামের ভিতরের প্রকোপকে বাহিরে ফুটাইয়া তুলিয়া রোগীকে আরোগ্য করে। সেই রকম হয়তো বা "কাম পাপ নয়" বলিয়া কামের উপরের চাপ সরাইয়া দিলে, দুইচারি দিন ব্যাভিচারের মাত্রা বেশী হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান যেমন বলিতেছে, কাম জীবনচলার পথে অবশ্য-প্রয়োজনীয় এবং উহাকে চাপিয়া রাখিলে জীবনকে ভিতরে ভিতরে উহা ক্ষয়ই করিয়া দিবে, সেইরূপ এই কামকে কি ভাবে ব্যবহার করিলে মানুষের জীবন ও সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষিত হইবে সে বিজ্ঞানও বাহির হইবে। এতদিন পুরুষের প্রবৃত্তিকে দমিত রাখিবার চেষ্টায় পাপের ভয় দেখাইয়া ঋতুবতী স্ত্রীতে চারি দিন গমন করা নিষেধ ছিল। কিন্তু পাপের ভয় না দেখাইয়া বিজ্ঞানের সাহায্যেই উহার নিষেধ মানুষের জীবনে সহজ করিয়া আনিতে হইবে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উহা স্বাস্থ্যের দিক দিয়া উভয়েরই এবং বংশধারারও অনিষ্টকর—ইহা কি মানুষ মানিবে না? মানুষের জীবনে যদি বিশ্বরূপ জীবন এবং বিজ্ঞানের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলেই মানুষ সংযমী হইতে বাধ্য হইবে। বিজ্ঞানের দৃষ্টি লইয়া, সহজ স্বাভা-বিক জীবন লইয়া মানুষ যদি বিশ্বসেবায় জীবন অর্পণ করিয়া জীবনের পথে চলে, তাহা হইলেই সহজ, সংযত, জীবন্ত জীবন যাপন করিয়া মানুষ সার্থক হইতে পারিবে।

স্মৃতি—আচ্ছা, তুমি বলিতেছ নারীজীবনের বেদনা ও তাহার দূরীকরণের কথা—ইহার ভিতর দুর্ব্বোধ্য পাতঞ্জলের দার্শনিক তত্ত্ব তুলিয়া আমাদের আলোচনাকে জটিল করিয়া তুলিতেছ কেন? মেয়েরা এই দার্শনিক তত্ত্বের কি জানে? আর জীবন পথে চলিতে যাইয়া

এই তত্ত্বেরই বা কি প্রয়োজন আছে? সহজ সরল জীবনের প্রশ্ন তুলিয়া সহজ ভাবে মীমাংসা দিলে কি ভাল হইত না? আমার মনে হইতেছে মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনা যেন জটিল হইতেছে। মেয়েরা কি বর্ত্তমান যুগের হাওয়ার মধ্য দিয়া নিজেদের মর্য্যাদা নিজেরা বুঝিয়া লইতে পারিবে না? তাহাদের নিকট এই সমস্ত তত্ত্ব উপস্থিত করিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

শ্রুতি—বর্ত্তমান সমাজে নারীজীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মূল কোথায় তাহা না বলিলে নারীজীবনের বেদনার সম্বন্ধে আলোচনা হইবে কিরূপে? সমাজ গঠনের গোড়ায় শাস্ত্রের ভিতর দিয়াই তাহাদিগকে ছোট করিয়া রাখা হইয়াছে, সেইজন্যই দর্শন শাস্ত্রের জটিল প্রশ্ন না তুলিয়া উপায় নাই। মেয়েরা দার্শনিক তত্ত্বের কোনই খোঁজ রাখেনা—সেইজন্য এসকল কথা বুঝিতে তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে সত্য। কিন্তু তাহাদের জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে দর্শন শাস্ত্রের এই সত্যকে জটিল মনে হইলেও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহাদের বুঝিতেই হইবে। নারীজীবনের বেদনার উদ্ভব কোন্ স্থান হইতে, কেমন করিয়া সমাজে এই বেদনার মূল ভিত্তি শিকড় গাড়িয়াছে, গোড়ার সেই তত্ত্ব না বুঝিলে মীমাংসা দিবে কি করিয়া?

শাস্ত্রই তো নারীর পরাধীনতার গোড়ায় রহিয়াছে। কাজেই তাহাদের সামনে এই সমস্ত তত্ত্ব উপস্থিত করিবার প্রয়োজন আছে। শাস্ত্র গড়িয়া মনু বলিলেন—"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।" স্ত্রীলোকের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। স্বাতন্ত্র্য নাই বলিয়া তাহাকে বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন থাকিতে হইবে। তাই তো ১২ বৎসরের মধ্যেই বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, কেননা তাহার পরেই স্বাতন্ত্র্য লাভের বয়স্ আসে। এখানে নারীজাতির উপর শাস্ত্রের এক বাঁধন পড়িল। আবার ভীষ্ম বলিলেন—"স্ত্রিয়ঃ অনৃতম্

ইতি শ্রুতিঃ"। শ্রুতিরও মত যে স্ত্রীজাতি মিথ্যা। এই আর এক বাঁধনের ব্যবস্থা হইল। এই সব শাস্ত্রের কথা না তুলিলে কেমন করিয়া নারীজাতি বুঝিবে তাহাদের এ দশা, এ অধঃপতনের সূত্রপাত কোন স্থান হইতে, কবে হইয়াছে? মেয়েদের সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরও কত কি যে রহিয়াছে, তাহার সব আমি জানিওনা। বেতাল ভট্ট কৃত এক শ্লোক মেয়েদের একেবারে গৃহের জড় পদার্থের সামিল করিয়া দিয়াছে। এই সব কথা না বুঝিলে মেয়েদের চৈতন্য আসিবে কি করিয়া? কোন সময়ে মেয়েরা "পণ্য" রূপেও শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কোনও শাস্ত্রে মেয়েদের পণ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াই তাহাদের উৎসবে এবং জনসমাগম স্থানে সজ্জিত করিয়া লইয়া দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করিবার কথা বলা হইয়াছে। মেয়েদের সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই বিচার ব্যবস্থা না তুলিলে মেয়েরা কেমন করিয়া বুঝিবে কতদিন হইতে কেমন করিয়া এই শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে? শাস্ত্রের ভাষা তুলিলে যদি আলোচনা জটিল হয় বল, তাহা হইলে আমি আর কি করিব? মনু আদি শাস্ত্রের মধ্য দিয়াই সমাজে নারীর যে কোন স্বাতন্ত্র্য নাই তাহা স্থাপন করিয়াছেন। সেইজন্যই আমাকেও শাস্ত্র তুলিয়াই উহার জবাব দিতে হইতেছে।

শাস্ত্র গড়িয়াছিলেন পুরুষেরা পুরুষকে প্রধান করিয়া; মেয়েদের প্রতি সুবিচার সেখানে হয় নাই। এই পথের খবর না জানিয়া যদি মেয়েরা অন্ধের মত পথ চলিতে যায়, পথ চলাই সার হইবে, দুই দিন পর আসিবে ক্লান্তি, আসিবে অবসাদ। তখন আবার পূর্ব্বের মতই অপমানের বোঝা মাথায় লইয়া ঘরে ঢুকিয়া ঘর করিতে হইবে, ঘরের বাহির হইবার কোন সার্থকতা হইবে না, প্রাণের বেদনাও যাইবে না। জীবনে তত্ত্বদৃষ্টি না থাকিলে জীবন সহজ হইবে কি করিয়া? তুমি যাহাকে সহজ জীবন বলিতেছ, উহা তো সহজ জীবন নয়; উহাই তো জটিল জীবন, অনেক সংস্কারের ভিতর দিয়া যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে।

ঐ পথে চলিতে যাইয়া জটিলতারই সৃষ্টি হইতেছে। মেয়েদের বর্ত্তমানের চলার ভঙ্গিতে পরিবারের ও সমাজের শৃঙ্খলা যে অচল হইয়া পড়িতেছে, এই চলাকে কি সহজ চলা বলিতে চাও? উহা সহজ চলা নয়, উহাই জটিল। এই জটিলতাকে সহজ করিবে যাহাকে তোমরা আজ জটিল মনে করিতেছ, সেই সহজ তত্ত্বজ্ঞান।

তুমি যে বলিলে তাহা সত্যই। বর্ত্তমান যুগের হাওয়ার ভিতর দিয়াই নারীজীবনের মর্য্যাদার প্রশ্ন আসিয়াছে, হাওয়ার ভিতর দিয়াই বিশেষ বিশেষ নারীজীবনের মাঝে কার্য্যকরীভাবে তাহার রূপও ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সামাজিকভাবে জনসাধারণকে এইভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে চিন্তাধারার গোড়ায় যে শাস্ত্রের বাঁধন রহিয়াছে, তাহাকে শাস্ত্রের ভিতর দিয়াই বদলাইয়া দিতে হইবে, শুধু হাওয়ার ভিতর দিয়া ইহার মীমাংসা হইবে না। এই হাওয়াকে দর্শনের ভিতর রূপ দিয়া নারীজীবনের সামনে ধরিতে হইবে। যেখানে তাহারা স্থির হইবে, তাহাই তো বলিতেছি। হাওয়া হাওয়াই থাকিয়া যায়, যদি সেই হাওয়াকে মানুষ জীবনে ধারণ করিয়া তত্ত্বের ভিতর দিয়া, শাস্ত্রের ভিতর দিয়া তাহার রূপ না দেয় এবং সেই রূপের চিত্র জনসাধারণের সামনে তুলিয়া না ধরে। দর্শনশাস্ত্রের ভিতর দিয়া না দিলে এই ভাবধারা জনসাধারণের ভিতর দেওয়া চলিবে না।

শাস্ত্রের ভিতর দিয়া কোনও কথা না বলিলে কি সমাজ তাহা লইতে পারে? এসেম্ব্লী হইতে আইন পাশ না হইলে কোন রাস্তার লোকের কথায় এমন কি মহাত্মা গান্ধীজী বলিলেও মানুষ লইতে পারে না, লয় না। সেই প্রকার শাস্ত্রের ভিতর দিয়া কোন কথা না দিলে সমাজ তাহা লয় না, লইতে পারে না। সমাজ ভিত্তির গোড়ায় যে দর্শনশাস্ত্র মেয়েদেরকে ছোট করিয়া রাখিয়াছে, সেই দর্শনশাস্ত্রের মূলে পুরুষ প্রকৃতির সমকক্ষতা স্থাপন করিয়া না লইয়া উপর হইতে সমকক্ষতা চাপাইয়া দিলে তাহাতে কোন স্থায়ী

কল্যাণ সাধিত হইবে না। এই কারণে বাধ্য হইয়া মেয়েদের দুর্ব্বোধ্য হইলেও দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছি।

বর্ত্তমান যুগে কতগুলি মেয়েকে এই কঠিন দর্শনশাস্ত্রকে জীবনে সহজ করিয়া লইতে হইবে এবং এই দর্শনের বার্ত্তা সঙ্গীত, সাহিত্য, কথকতা প্রভৃতির মধ্য দিয়া মেয়েদের ভিতর, সমাজের ভিতর ছড়াইয়া দিতে হইবে; নতুবা সমাজের কল্যাণ আনয়ন করা সম্ভব হইবে না। বর্ত্তমান যুগের রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র গণ-সাহিত্য ছড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই গণ-সাহিত্য সমাজের কাঠামোকে একটুকুও বদলাইতে পারে নাই ইহা নিশ্চিত জানিও। তাঁহাদের এই গণ-সাহিত্য সমাজের ইস্পাত কাঠামোতে আঘাত খাইয়া সমাজের বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িবে, সনাতন সমাজ আবার সেই সনাতনই থাকিয়া যাইবে। সেইজন্যই আজ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে গণ-দর্শনের, যাহা দ্বারা গণ-সাহিত্য সনাতন কাঠামোকে নবীনরূপে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। গণ-দর্শন ছাড়া গণ-সাহিত্য অচল, অবাস্তব, সাময়িক হুজুগমাত্র। পুরুষোত্তম-দর্শনই গণ-দর্শন। এই গণ-দর্শনই পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল বর্ত্তমান জগতে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

স্মৃতি—তুমি যে পাতঞ্জল দর্শনের দ্রষ্টা-দৃশ্যের কথা বলিয়াছ, উহার অর্থ আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও তো ভাই।

শ্রুতি—মুক্ত পুরুষের কাছে দ্রষ্টা পুরুষ অনাদি অনন্ত, দৃশ্যা প্রকৃতি অনাদি কিন্তু অনন্ত নহেন। প্রকৃতিকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করায় প্রকৃতি যে কবে হইতে কেমন করিয়া আছে তাহা জানা নাই কিন্তু আছে; এইরূপেই তাহার "অতীত" স্বীকৃত হইয়াছে। অতীত স্বীকার না করিয়া উপায় নাই; প্রকৃতি হইতেই যখন উদ্ভব তখন তাহাকে আর অস্বীকার করে কি করিয়া? বর্ত্তমান তো আছেই; তাহাকেও আর অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি অনন্ত নয়, জ্ঞান হইলে তাহার অন্ত আছে; একদিন তাহার শেষ হইবেই।

প্রকৃতি ঝঞ্ঝাটময়ী। আবেষ্টনই প্রকৃতি, ঘটনাই প্রকৃতি। সেইজন্য জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে প্রকৃতিকে মুছিয়া ফেলিয়া, সকল ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া সরল জীবন যাপন করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইজন্য প্রচলিত কৈবল্যতত্ত্বে প্রকৃতি নাই। প্রকৃতি যেখানে নাই, সৃষ্টিও সেখানে নাই। সৃষ্টি লোপের সাধনাই এদেশ লইয়াছে। তাই এদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। প্রকৃতির অনন্তত্ব স্বীকার করিলে, অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত পুরুষের সহিত অনন্ত প্রকৃতির যে অনন্ত বিশ্ব-সৃষ্টির লীলা চলিয়াছে তাহা মানুষের দৃষ্টির নিকট ধরা পড়িত।

ব্রজে এই জীবন্ত শাস্ত্রই প্রচারিত হইয়াছে। নিত্য নবীন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং নিত্য পরিবর্ত্তনশীলা, নিত্য নবীনা বিশ্ব-প্রকৃতির যুগল মিলনের ভিতর রহিয়াছে, "পুরুষও অনাদি অনন্ত, প্রকৃতিও অনাদি অনন্ত"।—এই দিব্যদর্শন সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগ-দেবতা সমন্বয়-ঘন পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন—"নির্ব্বিকল্প সমাধিও একটা ঘটনা, অতএব উহাও প্রকৃতি।" কোথায় যাইয়া পুরুষ প্রকৃতি-মুক্ত হইবে! প্রকৃতি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। ভারতবর্ষের ইষ্ট তাই রাধাকৃষ্ণ, ইষ্ট তাই শিবদুর্গা। পুরুষোত্তম জীবন-দর্শনে প্রকৃতির সহিত যুক্ত থাকিয়াই মানুষকে ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। আজ যেন ভাবিবার মত শক্তি মানুষের নাই, বিনা বিচারে সকলেই সব যেন মানিয়া চলিতেছে। কাহার ভিতর, কোন্ ঘটনার ভিতর কি তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া দেখিবার মত মনোবৃত্তি কাহারও নাই। ইহার অনেকটা কারণ অবশ্য দীর্ঘদিনের পরাধীনতা। বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সুযোগ সুবিধা তো নাই-ই, অবসরও নাই। দুটো অন্নবস্ত্রের জন্য করিতে হইতেছে হুড়াহুড়ি। কোথায় আমাদের দর্শন, কোথায় আমাদের বিজ্ঞান? জীবন আজ অন্ধকার।

স্মৃতি—আচ্ছা ভাই শ্রুতি, তুমি অতীতের উপর বর্ত্তমান গড়ে

বলিলে। অতীতের আদর্শ নারী তো সীতাও; তাঁহার মত সতী হইবার কথাই তো এতদিন শুনিয়াছি। আজ তুমি বলিতেছ আদর্শ নারী রাধারাণীর কথা। কেন, সীতা কি বর্ত্তমানের আদর্শ হইতে পারেন না? সীতা ও রাধা এই দুই নারীচরিত্রের সহিত বর্ত্তমান যুগের নারীদের কোথায় মিল বা অমিল, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

শ্রুতি—ভাই, এ প্রশ্নের জবাব তো তোমার নিজের মধ্যেই রহিয়াছে। তুমি তো ভাল মেয়ে, ভাল বৌ হইয়া অতীতের সীতা চরিত্রের অনুসরণ করিতে চাহিতেছ। কিন্তু তাহাতেই তৃপ্ত থাকিতে পারিতেছ না কেন? মন তোমার বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চায় কেন? তোমার নিজস্ব একটা গৌরবময় সত্তা আছে, যাহার সম্মান ও আস্বাদন না পাইয়া সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চায়। লক্ষ্মীমেয়ে, লক্ষ্মী-বৌ হইতেই মেয়েরা চায়, ইহা অতীতের সংস্কার। শ্রীরাধা তো সেরূপ লক্ষ্মী-বৌও ছিলেন না, লক্ষ্মী-মেয়েও ছিলেন না; তাঁহার ছিল কত দাবি; কিন্তু সে দাবি বর্ত্তমানের মেয়েদের মত'ও নয়। সে দাবির ভঙ্গিই ছিল আলাদা। কখনও কিছু না বলিয়া লক্ষ্মী-বৌ সাজিয়াই পুরুষের পিছনে নারীকে চলিতে হয়, কিন্তু উহাই তো তাহার জীবনের সবখানি কথা নয়। সীতাদেবী তো লক্ষ্মী-বৌ ছিলেন; তিনিই কি শেষ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী-বৌ থাকিতে পারিলেন? রাবণ জোর করিয়া সীতাকে লইয়া গিয়া রাক্ষসপুরীতে রাখিয়াছিলেন। সেই অপরাধে সীতাকে রামের নিকট বার বার অগ্নি পরীক্ষা দিয়া তবে তাহার সতীত্বের প্রমাণ দিতে হইল। কেন, রাম কি জানিতেন না যে সীতা রাম ছাড়া কিছু জানেন না? সেব্য যদি সেবকের হৃদয়ই না জানে, না বোঝে, সেরূপ হৃদয়হীন সেব্যের উপর সেবকের অভিমান দুর্জ্জয়। সীতা আত্ম-অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া তাই শেষে পাতালে প্রবেশ করিলেন। এ বিদ্রোহ কি সীতার রামের প্রতি

দুর্জ্জয় অভিমানেরই পরিচয় নয়? অভিমান হওয়াটা তো লক্ষ্মী-বৌ হওয়ার পক্ষে একান্ত অন্তরায়, স্মৃতি। লক্ষ্মী-বৌয়ের পক্ষে এ অভিমান পাপ।

স্মৃতি—ভাই, তুমি যে বলিলে সেব্য যদি সেবকের হৃদয় না বোঝে তাহার দুর্জ্জয় অভিমান হয় সেব্যের উপর। রাম কি বুঝিতেন না যে সীতা রাম ছাড়া কিছু জানেন না? কিন্তু কি করিবেন, তিনি যে রাজা, প্রজাদের তুষ্টি-সাধনের জন্য তিনি বাধ্য হইয়াই সীতার উপর এই অবিচার করিয়াছিলেন।

শ্রুতি—শ্রীরামের হৃদয় বুঝি স্মৃতি, তাঁহাকে হৃদয়হীন বলিতে প্রাণে বেদনাও লাগে, তবুও বিচার করিলে ঐ হৃদয়কে সমর্থন করা যায় না। তিনি ছিলেন রাজা, সে হিসাবে সীতাও তাঁহার রাজ্যের একজন নারী প্রজা, তদুপরি তিনি স্বামী—এই দুই দিক দিয়াই তো সীতা সুবিচার পাইতে পারেন। তিনি কি তাহা শ্রীরামের নিকট পাইয়াছিলেন? এখানে ছিল শ্রীরামচন্দ্রের স্বামিত্বের ও রাজপদের অভিমান। তিনি নিরপেক্ষভাবে হৃদয়ের দিকে তাকাইয়া বিচার করেন নাই। শ্রীরামচন্দ্র মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম, আর শ্রীকৃষ্ণ লীলা-পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাই প্রাণের দেবতা, প্রাণবল্লভ। এই প্রাণের ডাকে পাগল হইয়া ব্রজগোপীগণ ব্যবহারিক জগতের মান-সম্মান, কুলশীল সব যমুনার জলে ভাসাইয়া দিয়া এই মূর্ত্তিমান প্রাণের পূজায় প্রাণ জুড়াইয়াছিলেন। অতীত যুগের পুরুষোত্তম শ্রীরাম-চরিত্র ও সীতা চরিত্র সবখানি জীবনের মীমাংসা দিতে পারে নাই; সেইজন্যই তাঁহারা রূপ বদলাইয়া আসিয়াছেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধারূপে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা চরিত্রই যুগের সমস্যা সমাধানের আদর্শরূপে দাঁড়াইয়া; তাঁহাদের এখন সমাজ-জীবনে মিলাইয়া লইতে হইবে। যেখানে সীতা-প্রকৃতির পাতাল প্রবেশ, সেখান হইতেই বিপ্লবময়ী রাধা-প্রকৃতির উদ্ভব। এইখানে দাঁড়াইয়াই বর্ত্তমান নারী-জীবনের বিদ্রোহ।

স্মৃতি—আচ্ছা ভাই, রাধা প্রকৃতির সহিত বর্ত্তমান নারী প্রকৃতির সংযোগ কোথায়, কেমন করিয়া, তাহা বুঝাইয়া দাও না ?

শ্রুতি—শ্রীরাধা যেমন তাহার ক্লীবপতি রায়ানের নিকট জীবনের সর্ব্ব স্তরের খোরাক না পাইয়া বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বর্ত্তমান মেয়েরা পুরুষদের নিকট তাহাদের জীবনের সর্ব্ব স্তরের খোরাক পাইতেছে না বলিয়া তাহারাও বিদ্রোহ করিতেছে। এইস্থানে বর্ত্তমান মেয়েদের সহিত রাধা সমধর্ম্মী। মানুষের জীবনের পাঁচটী কোষ আছে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। এই পাঁচ স্থানের খোরাক পাইলে তবে সে তৃপ্ত থাকিতে পারে। প্রত্যেক মানুষের ভিতরই একটা পরিপূর্ণ জীবন লাভের খোঁচা রহিয়াছে। মানুষের অজ্ঞাতসারেও সেই খোঁচা তাহাকে পরিপূর্ণতার দিকে টানিয়া লইয়া যায়। বর্ত্তমান সমাজ অযোগ্যতায় পরিপূর্ণ ; অযোগ্যতাই তো ক্লীবত্ব। কোন-কিছু সৃষ্টি করিতে না পারাই ক্লীবত্ব। মানুষের আজ কোন কোষের খোরাক দিবার যোগ্যতা নাই। হয়ত কোন কোন স্থানে অন্নময় কোষের খোরাক পাওয়া যায়, কিন্তু মান পাওয়া যায় না। অন্ন এবং মান দুইটাই মানুষের জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহার উপর রহিয়াছে জ্ঞান-আনন্দের প্রশ্ন। দীর্ঘদিন নারীজীবনের এই কোষগুলি উপবাসী থাকায় আজ তাহারা করিতে চাহিতেছে বিদ্রোহ।

আমাদের দেশে যদি যোগ্য পিতা, যোগ্য স্বামী, যোগ্য গুরু, যোগ্য রাজা থাকিতেন, তাহা হইলে কি মানুষ এত বিভ্রান্তের মত রাস্তায় ছুটাছুটি করিত ? মেয়েরা আজ স্থানচ্যুত কেন ? নারী ঘরে পুরুষদের নিকট জীবনের মান সম্মান, জ্ঞান-আনন্দ পাইতেছে না। সেইজন্য তাহারা প্রাণের জ্বালায় ঘর ছাড়িয়া বাহিরে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের অধিকারের দাবি জানাইতেছে। পিতা যদি যোগ্য পিতা হইতেন, স্নেহময় পিতার কোল ছাড়িয়া, তাহার স্নেহের বাঁধন কাটিয়া, মেয়েরা স্বাধিকার লাভের জন্য বাহিরে আসিয়া হুড়াহুড়ি করিত না। স্বামী যদি যোগ্য স্বামী হইতেন, স্ত্রী স্বামীর

ভালবাসা ভুলিয়া বাহিরে ছুটাছুটি করিত না। গুরু যদি যোগ্য গুরু হইতেন, শিষ্য কুল-গুরু ছাড়িয়া জ্ঞানের পিপাসায় বাহিরের গুরুর পিছনে পিছনে ছুটিয়া লাঞ্ছিত হইত না। রাজা যদি যোগ্য রাজা হইতেন, প্রজারা রক্তাক্ত পথ বাছিয়া লইত না।

ব্রহ্মময়ী রাধারাণী ব্রজে ক্লীব রায়ানের অযোগ্যতায় তিক্ত হইয়া, বেদনাতুর হইয়া নিজ জীবনের ব্যর্থতাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্যই ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বাহিরে আসিয়া পরমব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে জীবন সমর্পণ করিয়া সার্থক প্রকৃতি, পরাপ্রকৃতি-রূপে বিশ্বের নিকট আরাধ্য হইয়াছিলেন। সেইরূপ বর্ত্তমান নারী-প্রগতির মূলেও পুরুষের অযোগ্যতা এবং শোষণে নারীর পুঞ্জীভূত বেদনার ইতিহাসই রহিয়াছে। শ্রীরাধার ঘর ছাড়ার মূলেও যে বেদনা, যে অপমান ছিল, বর্ত্তমান নারী-প্রগতির মূলেও রহিয়াছে সেই অপমান, সেই বেদনার কাহিনী। এইস্থানে রাধা-প্রকৃতির সহিত বর্ত্তমান নারী-প্রগতির ঐক্য।

স্মৃতি—আচ্ছা শ্রুতি, তুমি যে পঞ্চ কোষের কথা বলিলে, উহার কোন্ কোন্ স্তরে মানুষের কিরূপ অবস্থা হয় খুলিয়া বল; তোমার কথা শুনিয়া কত প্রশ্নই মনে উঠিতেছে।

শ্রুতি—বড় হইবার একটা স্বতঃসিদ্ধ খোঁচা মানুষের জীবনে রহিয়াছে। এই খোঁচা ছাড়া মানুষ নাই। প্রেমই হইতেছে মানুষের স্বরূপ; শ্রীভগবান প্রেমঘন। এই স্বরূপকে পাইবার পথে, ভগবানকে পাইবার পথে, জীবনকে পাইবার পথে মানুষ ছুটিয়াছে অনন্তকাল। এই ছোটার পথে মানুষকে পাঁচটী স্তরের সমন্বয় করিতে হয়। অর্থাৎ পাঁচটী স্তরই যখন হাত ধরাধরি করিয়া জীবনের মাঝে দাঁড়ায়, তখনই মানুষ তাহার স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম অন্নের স্তর। সাধারণ দৃষ্টিতে অন্ন যাহার প্রচুর আছে সে-ই বড় লোক। কিন্তু শুধু অন্নের স্তরে বড় হইলেই মানুষ বড় নয়, যদি না সে

প্রাণের স্তরে বড় হয়। শুধু অন্ন আছে, প্রাণ নাই, সে অন্ন বিশ্বের বা সমাজের কাহারও কোন কাজেই লাগে না। যাহা শুধু একার ভোগের জন্য, তাহা কাহাকেও কোন দিন আনন্দ দেয় না, কল্যাণও আনে না। দেখিতেই তো পাইলে দেশের দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া মরিল, আর একদল সেই অন্ন বেচিয়াই প্রচুর টাকা করিল। তাহাদের যদি প্রাণ থাকিত, দেশের সেবায় সব দিয়া সেবার নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিত; দেশও বাঁচিয়া যাইত। অন্নের ক্ষেত্রে প্রাণ আসিলে সেই অন্ন আর মানুষ একা ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না, সে তখন তাহার পরিবার, তাহার সমাজ, তাহার জাতির কথা ভাবিতে থাকে। প্রাণের স্পর্শে অন্নের ক্ষেত্র তখনই হয় বড়।

আবার এই অন্ন ও প্রাণের স্তরেও মানুষের বড় হইবার সাধ মেটে না, প্রাণের স্তরকে যদি মন আসিয়া আলিঙ্গন না করে। প্রাণ শুধু তাহার পরিবার, সমাজ ও জাতি লইয়াই ছিল; মনের স্তর যখন আসিয়া প্রাণের স্তরের গলা ধরিল, সে তখন বিশ্ব-মানবের ভাবনা ভাবিতে আরম্ভ করিল। কেননা মনের দৃষ্টি আরও ব্যাপক। কেমন করিয়া বিশ্বের মান, বিশ্বের গৌরব রক্ষিত হয়, সে তখন সেই চিন্তায়ই পাগল। তাহাতেও সে তৃপ্ত হইতে পারিবে না, যদি এই মনের স্তরে বিজ্ঞান আসিয়া অবতরণ না করে। বিজ্ঞান যখন মনের আকুলি ব্যাকুলিতে আসিয়া মনের গলা ধরিল, তখন বিশ্বের সকল প্রাণীসমূহকে, সকল উদ্ভিদ্‌সমূহকে সে নিজের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই চেতনা যখনই মানুষের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেয় তখন সে আনন্দ রসে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তাহার দৃষ্টিতে তখন সমস্ত বিশ্ব, বিশ্বের সমস্ত ধূলিকণা আনন্দঘন ভগবানের প্রকাশ বলিয়া স্ফুরিত হয়, হৃদয় তখন ভগবৎপ্রেমে পাগল হইয়া যায়। ধূলিতে প্রেমই আনন্দময় কোষের স্বরূপ। তখনই মানুষের জীবনের

সবটুকু "আনন্দময় আমি আছি—" এই বাণী স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে গাহিয়া উঠে।

এই বড় হওয়ার, এই "আমি আছি"র খোঁচাতেই আজ ভারতবর্ষের মেয়েরা ঘরের বাহির হইয়াছে। এই খোঁচাই ভারতের আকাশে বাতাসে ঘুরিতেছে, ইহা যে ভারতেরই সম্পদ। ঐ "আমি আছি"র খোঁচাতেই একদিন ব্রজগোপীগণ ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে জীবন বিলাইয়া, পুরুষোত্তমজীবন পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঘর ছাড়া মেয়েদিগকে এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণজীবনের খোঁজ করিতে হইবে। যাঁহার ডাকে তাহারা ঘর ছাড়িয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই জীবনে পাইবার জন্য ব্যাকুল হওয়া প্রয়োজন। যদি তাহারা পুরুষোত্তমজীবন পায় তবেই তাহাদের জীবন সমর্পণ করা সার্থক হইবে, জীবন ধন্য হইবে। যেখানে সেখানে কাপুরুষের কাছে জীবন বিলাইয়া নিজকে অপমানিত হইতে না দেওয়ার জন্য তাহাদের দৃঢ়পণ করা উচিত।

বিনা সাধনায় কেহ কাহাকেও কোন দিন পায় নাই। শিব দুর্গাকে পাইয়াছিলেন বিশ্বরূপের সাধনা করিয়া, দুর্গা শিবকে পাইয়াছিলেন বিশ্বরূপের সাধনা করিয়া, তাই তাঁহারা আদর্শরূপে বিশ্বের পিতা এবং বিশ্বের মাতা বলিয়া পূজিত। প্রেমঘন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণী উভয়েই উভয়কে ভজনা করিয়া তবে পাইয়াছিলেন। বিশ্ব তাই তাঁহাদিগকে ইষ্টরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে। এই বিশ্বসৃষ্টির মূলেও রহিয়াছে ব্রহ্মার তপস্যা। পাইতে হইলে সাধনা করিতেই হইবে। বিনা সাধনায় পথে ঘাটে যেখানে সেখানে পুরুষ নারীকে পাইবে না, নারীও পুরুষকে পাইবে না; পাওয়া কি এতই সহজ? আজ পাইতেছে না কেহই কাহাকেও। পাইতে হইলে সাধনা করিতেই হইবে, যোগ্য হইতেই হইবে, নারীকে নারায়ণী হইতে হইবে, নরকেও নারায়ণ হইতে হইবে; তবেই হইবে সত্য বাস্তব পাওয়া।

স্মৃতি—ঘর ছাড়া ও সমাজ ছাড়া ব্রজের এ আদর্শ তুমি সমাজে কি করিয়া দিবে? আমি তো ইহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

শ্রুতি—এ প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে বলিতেছি। একটা সমগ্র জীবনের তত্ত্ব বলিতে যাইয়া অনেক ঘটনা তুলিতে হইতেছে। আমি ক্রমে তোমার ঐ প্রশ্নে আসিব। নারী জাতি ঘর করিতে আরম্ভ করিয়াছিল পুরুষকে অবলম্বন করিয়া; সেই পুরুষ যদি ঠিক থাকিত, পুরুষোত্তম হইত তবে তাহাকে ধরিয়া মেয়েরা সার্থক হইত। ঘরে যদি মেয়েরা জীবনের সার্থকতা লাভ করিত তবে কি আর তাহারা ঘর ছাড়ে? ঘর ছাড়ার তো ভাই অনন্ত বিপদ দেখিতেই পাইতেছ। ঘর ছাড়ার এই বিপদের জন্যই মেয়েরা এতদিন শত লাঞ্ছনা অত্যাচার সহ্য করিয়াও ঘরে থাকিত। যাহারা সহ্য করিতে না পারিত তাহারা আত্মহত্যা করিত। আজ সহিবার সীমাও যেমন অতিক্রম করিয়াছে, তেমনি বাহির হইবার জন্য বাহির হইতেও কালের মধ্য দিয়া একটা টান আসিয়াছে, সুযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। এইজন্য তাহারা ঘর ছাড়িয়া বাহিরে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাহির তো তাহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত ক্ষেত্র; বাহিরে যে কাড়াকাড়ি চলিয়াছে তাহার ভিতর তাল সামলাইয়া চলিবার মত বুদ্ধি কি বর্ত্তমান মেয়েদের আছে! এই কাড়াকাড়ি হইতে নিজকে রক্ষা করা কি তাহাদের পক্ষে সম্ভব, যদি না রাধারাণীর মত বাহিরে আসিয়া কোন উত্তম-পুরুষ পুরুষোত্তমকে তাহারা না পায়? তাহাদের তখন ঘাটে ঘাটে দুর্গতির অবধি থাকিবে না; বর্ত্তমানে হইতেছেও তাহাই।

স্মৃতি—সত্যি ভাই, মেয়েদের ঘর ছাড়িয়া বাহিরে বাহির হইবার বিপদ অনেক, কিন্তু ইহা জানিয়াও তো তাহারা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। এমন করিয়া এতদিনের ঘরের বাঁধন মেয়েদের আল্‌গা হইয়া গেল কেন?

শ্রুতি—আমাদের সমাজ কি ভাবে গড়া এবং কোথা হইতে সংসারের ভাঙ্গন ধরিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমাজ পুরুষ-প্রধান হওয়ার ফলে সর্ব্ববিধ চাপ মেয়েদের উপর যাইয়া পড়িল, মেয়েদের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য-বোধ স্ফুরিত হইবার পথে একান্ত বাধার সৃষ্টি হইল। স্বাতন্ত্র্য-বোধ জাগ্রত হইতে না পারার ফলে মেয়েরা গেল শুকাইয়া। নারীজাতি শুকাইয়া যাওয়ার জন্যই জীবন্ত পরিবার আর গঠিত হইতেছে না। ব্রজে রাধা-রাণীর অবতরণই নারীর প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাই আজ যে মেয়েদের মধ্যে কালের ধর্ম্মে স্বয়ংমূল্যবোধ জাগ্রত হইয়াছে, তাহার অর্থই আমরা ব্রজের রাধারাণীর চিত্রে পাইব। মেয়েদের এই বর্ত্তমান জাগৃতির ফলে আজ চারি জাতীয় নারীর সৃষ্টি হইয়াছে।

স্মৃতি—এই চারি জাতীয় মেয়েদের লক্ষণ কি? তাহারা কি সবাই ঘর ছাড়া?

শ্রুতি—সমাজে পাঁচ স্তরের মেয়ে রহিয়াছে। একদল মেয়ে আছে, সমাজ যতই কেন না অত্যাচারী হউক, হাসিমুখে তাহারা সেই অত্যাচারকে সহ্য করিয়া যাওয়াটাকেই সতীত্ব বলিয়া, গৌরব বলিয়া মনে করে। ইহারা ঘর ছাড়ার কল্পনাও করে না। অপর একদল মেয়ে অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ মনে মনে করে, কিন্তু মুখে কিছু বলিবার সাহস তাহাদের নাই। তাহাদের বেদনা তাহাদের প্রাণকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিলেও তাহারা কোনও প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যায়। আবার কখনও কখনও তাহাদের বিদ্রোহ সংসার-জীবনকে বিষাক্ত করিয়াও তোলে। তৃতীয় দল স্বামীর পরিবারের কাহারও সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া, স্বামীকে তাহার আত্মীয় স্বজনের সকল সম্পর্ক হইতে কাড়িয়া লইয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়ে। সংসার-জীবন যাপন সম্বন্ধে তিক্ত ধারণা লইয়া আর একদল সংসার একেবারে করিবে না স্থির করিয়া লইয়া ঘরের বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। অপর

একদল সমাজ হইতে বাহির হইয়া গিয়া বারনারী-জীবন যাপন করে। এই পাঁচ দলের প্রথমদল একেবারে অতীতের শক্ত খুঁটায় বদ্ধ, তাহাদের ভিতর এখনও বর্ত্তমান বিশ্বের বিপ্লবের সাড়া পৌঁছে নাই। অপর চার দলই ঘর ছাড়া, ইহাদের সকলের আদর্শই রাধা-চরিত্র। মেয়েদের স্বাভাবিক গতি হইল নিজকে একস্থানে নিঃশেষে ডুবাইয়া দেওয়া; তাহারা ডুবিবার জন্য ব্যাকুল। রাস্তায় বাহির হইল বলিয়া প্রকৃতি তো বদলাইল না। কিন্তু ডুবিবে কোথায়? সমুদ্র ব্যতীত তো ডোবা যায় না? ডোবার জলে কি ডুবিয়া মরা যায়? না সে মরায় কোন সার্থকতাই আছে? মানুষ মরিতে চায় না, মরিয়া বাঁচিতে চায়। এই মরিয়া বাঁচিবার কৌশল নারীকে শিখিতে হইবে। নতুবা কাপুরুষ লইয়া জলে ডুবিয়া মরিবার ইতিহাসই বাড়িয়া চলিবে।

স্মৃতি—তোমার কথা শুনিয়া মন বেদনায় ভরিয়া উঠিতেছে। ঘর ছাড়া মেয়েরা তবে কোথায় ডুবিবে? সমুদ্র তাহারা কোথায় পাইবে?

শ্রুতি—মেয়েরা কোথায় ডুবিবে বলিতেছ কেন? তাহারা কাহার ডাকে ঘরের বাহির হইল? যে আত্মার অবমাননায়, যে প্রাণের তাড়নায়, যে আদর্শের খোঁচায় তাহারা ঘরের বাহির হইয়াছে, তাহাদের ডুবিতে হইবে, স্থিত হইতে হইবে সেইখানেই। নিজ নিজ আত্মকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া স্ব-জ্যোতিতে নিজ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জীবনকে বাড়াইয়া তুলিতে হইবে, তবেই না হইবে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া বিপ্লব করার সার্থকতা? নারীসমাজ যেদিন আদর্শে স্থিত হইয়া তাহার জীবনকে বাড়াইয়া তুলিবে, সেইদিন তাহার বর্দ্ধিত জীবনের চাপে পুরুষ ফাঁপরে পড়িবে। বাধ্য হইয়া পুরুষকে তখন কাপুরুষত্ব পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম হইবার পথে রওনা দিতে হইবে। মেয়েদের আপনার মাঝে আপনি গড়িয়া উঠিবার ধাক্কায় স্বাধিকার-প্রমত্ত পুরুষ-প্রধান সমাজ-দণ্ড খসিয়া পড়িবে। বর্ত্তমানে মেয়েরা যে অভিযান করিয়াছে

ইহা তো বিপ্লব নহে, ইহা হইল বিদ্রোহ। ইহাতে সমাজ গড়িবে না, ধ্বংসই হইবে। বিপ্লবের ভিতর রহিয়াছে গঠন; এই বিপ্লবের আদর্শই রাধারাণী।

স্মৃতি—তুমি বলিলে বর্ত্তমানে মেয়েরা যে অভিযান করিয়াছে ইহা বিপ্লব নহে, বিদ্রোহ। বিপ্লব ও বিদ্রোহের পার্থক্য কি বুঝাইয়া বল না ভাই?

শ্রুতি—বিপ্লবের ভিতর থাকে প্রেম, থাকে একটা গঠনাত্মক ভাব। বিদ্রোহের মূলে থাকে প্রতিহিংসা, ধ্বংস করিবার মনোবৃত্তি। বর্ত্তমান নারী-প্রগতি বিদ্রোহাত্মক। সেইজন্য তাহারা জীবনের দিক দিয়া বাড়িতে পারিতেছে না, করিতেছে কেবল সমাজ জীবন, পরিবার জীবনকে ধ্বংসই। বিদ্রোহ সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতার অভিব্যক্তি। বিপ্লবের রূপ বিরাট, বিশ্বজনীন। বিশ্বের বেদনাকে নিজের ভিতর জমাইয়া তুলিয়া বিশ্বকে গড়িয়া তুলিবার জন্য বিশ্বের সামনে যে ঘোষণা, তাহাই বিপ্লব। ঐতিহাসিক রাধারাণী মূর্ত্তিমতী বিপ্লব। তাঁহার বিপ্লব সমস্ত অত্যাচারিতা লাঞ্ছিতা প্রকৃতিরই বিপ্লব, সকলের পক্ষ হইয়া সকলের বেদনাকে নিজের বুকে ঘনীভূত করিয়া সকলকে গড়িবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা। সেইজন্যই তাঁহার বিপ্লবে গড়িয়া উঠিয়াছিল গোপীসংঘ। "গুহ্যতম কান্নাকে বিশ্বজনীন করিয়া তোলার নামই বিপ্লব।" বিপ্লবের ভিতর একটা গঠন থাকিবেই। ধর্ম্মগ্লানির বেদনায়, বেদনার বিগ্রহ মহাপ্রভু করিলেন বিপ্লব; তাঁহার সেই বিপ্লবে গড়িয়া উঠিল বৈষ্ণব সম্প্রদায়। সাবিত্রীর বিপ্লবে যমরাজ স্তম্ভিত হইয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহার মৃত স্বামীকে। বেহুলার বিপ্লব কি ভীষণ, কি কষ্টসাধ্য, কি দৃঢ়তাব্যঞ্জক, যে বিপ্লবে বাঁচাইয়া আনিল মৃত গলিত স্বীয় পতিকে! ইহাই হইল বিপ্লবের সার্থক রূপ। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, বর্ত্তমান নারী-প্রগতি বিপ্লব নহে, বিদ্রোহ।

স্মৃতি—আচ্ছা, তুমি বলিলে রাধারাণীর বিপ্লব গঠনমূলক; ইহার অর্থ বুঝিলাম না; রাধাচরিত্রে কি কর্ম্মধারা প্রবর্ত্তিত বা গঠিত হইয়াছিল?

শ্রুতি—কি আশ্চর্য্য স্মৃতি! তুমি রাধার বিপ্লবের ভিতর কি গঠনকৌশল ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই বুঝিতে পারিতেছ না? বর্ত্তমান যুগে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় যে সংঘ রচনা, তাহাই তাঁহার জীবনে তাঁহার বিপ্লবের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সংঘের মধ্য দিয়াই সে দিন গোপীকুল সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নবীন জীবনের খোঁজ আনিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরাধার সেই সংঘ গঠনের ভিতর যে তত্ত্ব বা আদর্শ লুকাইয়াছিল, তাহাই আজ যুগধর্ম্মে বাস্তবের ক্ষেত্রে রূপ লইবার জন্য ভারতের বুকে আগত। ভারতের সর্ব্ব সমস্যার সমাধানের মূলে রহিয়াছে এই সংঘ গঠন।

স্মৃতি—ভারতের সমস্যা সমাধান করিবার জন্য সংঘ গড়িবার এমন কি প্রয়োজন রহিয়াছে, আর সেই সংঘই বা আজ মানুষ গড়িতে পারিতেছে না কেন?

শ্রুতি—সংঘব্যতীত কোন জগৎ-হিতকর কার্য্যই হয় না; সংঘ-শক্তিই জগতের কল্যাণ আনয়ন করে। আজ যে ভারতবর্ষের এ দুর্দ্দশা, তাহার কারণ তাহার বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি। প্রকৃতির ক্ষেত্রই খণ্ডের ক্ষেত্র। খণ্ডের একটি স্বাভাবিক প্রকৃতি এক খণ্ডের অপর খণ্ডের সহিত লড়াই করা। এ দেশের শাস্ত্র সেইজন্য খণ্ডের ঝগড়াকে এড়াইবার জন্য দ্বন্দ্বাতীত অখণ্ডের কথা বলে। সংঘ যে গড়িতেছে না, তাহার মূলে রহিয়াছে এই খণ্ড-অখণ্ডের ঝগড়া। ছোট বেলা একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। একটী মেয়েকে বিবাহের জন্য বরের বাড়ী হইতে দেখিতে লোক আসিয়াছে। পাশের ঘরে উক্ত লোকটী থাকায় অপর ঘরে হামান-দিস্তায় চাল গুঁড়া করিতে বসিয়া মেয়েটী খুব অসুবিধা বোধ করিতেছিল; কেননা তাহার হাতের কাঁচের চুড়িগুলি কেবলই শব্দ করিতেছিল। ইহাতে তাহার লজ্জা হইতেছিল। সে তখন একে একে হাতের কাঁচের চুড়িগুলি ভাঙ্গিতে আরম্ভ

করিল; যখন মাত্র এক গাছা চুড়ি অবশিষ্ট থাকিল, তখন আর কোনও শব্দ হইল না। ইহা দ্বারা মেয়েটীর এই জ্ঞান হইল যে, বহু হইলেই যত গণ্ডগোল। বিবাহ করিলেই এক হইতে দুই, দুই হইতে বহু হইবে—অতএব আমি আর বিবাহ করিয়া ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করিব না; আমি একাই থাকিব। ইহাই হইল অতীত সমাজের চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারার ফলে খণ্ড-প্রকৃতি পড়িল বাদ; একান্ত অখণ্ডের, একের পূজা করিতে যাইয়া ভারতবর্ষ আজ বিচ্ছিন্ন ভারতে পরিণত। যে ঝঞ্ঝাটময়ী খণ্ড-প্রকৃতি অস্বীকৃত হইয়াছিল, আজ তাহারই জয়গানে সর্ব্বত্র মুখরিত; অখণ্ড ব্রহ্মই আজ বাদ পড়িয়া যাইতেছেন। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। এখন এই বিচ্ছিন্ন ভারতকে সংঘবদ্ধ করিতে হইলে প্রয়োজন খণ্ড-অখণ্ড সমন্বয়ের চিন্তাধারা ও দর্শনের স্থাপনা। তবেই গড়িয়া উঠিবে সংঘ।

পাবনা জেলা জেলা হিসাবে এক, গ্রাম হিসাবে বহু। পাবনা যদি বলে—বহু গ্রাম বাদ দিয়া আমি এক পাবনাই থাকিব, পাবনা তখন শূন্যে পরিণত হইবে। তখন আর জেলার ব্যাপকত্ব, অখণ্ডত্ব কিছুই থাকে না। বাস্তবিক পক্ষে তো সকল গ্রামের সমষ্টিই জেলা। সকল গ্রামবাসীই যখন বলে—"আমি পাবনা জেলার লোক", তখন ইহা নিশ্চিত সত্য যে, প্রত্যেক গ্রামের বুকেই অখণ্ড পাবনা জেলা রহিয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডই স্বয়ং পূর্ণ। প্রত্যেক খণ্ডই নিজের মাঝে এক হিসাবে পূর্ণ; কিন্তু যেহেতু জেলার পরিচয় দিতে হইলে গ্রামের প্রয়োজন হয় না, অথচ গ্রামবাসীর পরিচয় দিতে হইলে জেলার প্রয়োজন হয়, সেইজন্য সেইখানে প্রতি খণ্ড-গ্রামের অন্তরে একটি অপূর্ণতাও রহিয়াছে এবং সেই অপূর্ণতার সুযোগ লইয়াই জেলা গ্রামকে অস্বীকার করে। খণ্ড-গ্রামের এই অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় ভরিয়া তুলিবার জন্যই সকল খণ্ড গ্রামের হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। স্বয়ংপূর্ণ গ্রামগুলি যখন হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়ায়, তখনই সেই অন্যোন্য-

বদ্ধবাহু গ্রামগুলিই জেলায় পরিণত হয়। একটী খণ্ড-গ্রাম যদি অপর খণ্ড-গ্রামগুলির সহিত সম্পর্ক না রাখে, তখন সেই ক্ষুদ্র খণ্ড-গ্রামের উপর অখণ্ড জেলার অত্যাচার চলিতে পারে, কেন না জেলা তখন গ্রাম হইতে অনেক বড়। এই ছোট-বড়র শোষণ নীতিতে সমাজ গড়া। স্বয়ংপূর্ণ খণ্ড-গ্রামগুলি যখনই পরস্পর পরস্পরের সহিত সংঘবদ্ধ হইল, অখণ্ড জেলা তখনই তাহার সমকক্ষ। খণ্ডসমষ্টি ও অখণ্ডের এই সমকক্ষতার কথাই রহিয়াছে পুরুষোত্তমদর্শনে। কেহ কাহাকেও অস্বীকার করিয়া দীর্ঘদিন চলিতে পারিবে না। উভয় উভয়কে স্বীকার করিলেই হইবে উভয়ের সত্যতার প্রতিষ্ঠা। তখনই ফিরিয়া আসিবে বিচ্ছিন্ন ভারতের কল্যাণ। খণ্ড-অখণ্ডের এই মিলনকৌশল শিখাইতেই ব্রজে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা।

স্মৃতি—তুমি বলিলে খণ্ডের একটি ধর্ম্ম অপর খণ্ডের সহিত লড়াই করা; তবে আর এক খণ্ড অপর খণ্ডের হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইবে কি করিয়া?

শ্রুতি—খণ্ডসমূহের এই মিলন-তত্ত্বই ব্রজলীলার ভিতর রহিয়াছে। গোপীদের আত্মা, গোপীদের স্বরূপ, গোপীদের আদর্শ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। যেদিন সমাজের নিপীড়নে গোপীগণ নিপীড়িত, সেইদিন তাঁহাদের আদর্শ বাহিরে রূপ ধারণ করিয়া বাহির হইতে ডাক দিল; তখন সেই ডাকে ব্রজগোপীগণ যে যাহার মত নিজেদের ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। একের অপরের খবর লইবার অবসর পর্য্যন্ত ছিল না। পথে বাহির হইয়া যখন শুনিতে পাইলেন যে, সকলে একই আদর্শের টানে ঘরছাড়া, তখন তাঁহারা সবাই একই বেদনার সূত্রে, শ্রীরাধাসূত্রে গ্রথিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিলেন। সকলের সব বেদনার ঘণীভূত মূর্ত্তিই বেদনাময়ী পরাপ্রকৃতি শ্রীরাধা। সকল ব্রজগোপীর অখণ্ড আত্মস্বরূপ, মূর্ত্তিমান আদর্শ যে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আসিয়া তখন সেই মূর্ত্তিমতী বেদনার নিকট

ধরা দিলেন। সকল খণ্ড প্রকৃতি এ উহার হাত ধরিয়া সেই বিরাট অখণ্ড সত্তার ভিতর আত্মসমর্পণ করিয়া নিজ নিজ স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। পুরুষোত্তমের আদরে পুঞ্জীভূত অনাদরের জ্বালা জুড়াইল। এই খণ্ড-অখণ্ডের মিলনই ব্রজে রাসলীলা। প্রতি দুইটি খণ্ড গোপীর মাঝে অখণ্ড কৃষ্ণ বিরাজমান থাকিয়াই রাসনৃত্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই খণ্ড প্রকৃতির গলা ধরিয়া অখণ্ড ব্রহ্মের নৃত্যের ভিতর হইতেছে বিশ্বের বিরাট সংগঠনতত্ত্ব স্ফুরিত। অখণ্ড আদর্শরূপী পুরুষের ভিতরেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সংঘ গড়িয়া উঠা সম্ভব। জীবন্ত মূর্ত্ত অখণ্ড আদর্শের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন খণ্ড প্রকৃতি পরস্পরের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া মিলিতে পারে। খণ্ডের জীবনে জীবন্ত আদর্শবোধ জাগ্রত হইলেই খণ্ডের সংঘ গড়িয়া উঠে; খণ্ডের সংঘ গড়িলেই অখণ্ড সেখানে ধরা পড়ে। এই খণ্ড-অখণ্ডের মিলনেই বিশ্ব স্বস্থ হইতে পারে।

স্মৃতি—আচ্ছা ভাই, তুমি যে পুরুষোত্তমের কথা বলিতেছ, এই পুরুষোত্তম কাহাকে বলে? পুরুষোত্তমের লক্ষণ কি?

শ্রুতি—যিনি একাধারে বিস্তীর্ণ ও গভীর, তিনিই ভগবান। সাধারণতঃ দেখা যায় যাহা স্বভাবতঃ বিস্তীর্ণ, তাহা গভীর নয়; আবার যাহা গভীর, তাহা বিস্তীর্ণ নয়। স্বরূপে ভগবান গভীর, বিশ্বরূপে তিনি বিস্তীর্ণ। এই স্বরূপ-বিশ্বরূপ সমন্বয় করিয়া যখন ভগবান মানুষী তনু ধারণ করিয়া ঐতিহাসিক রূপে বিশ্বের বুকে দাঁড়ান, তখন তিনিই পুরুষোত্তম নামে প্রথিত হন। এই পুরুষোত্তমই শ্রীকৃষ্ণ। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই ভগবান। পুরুষোত্তম নিত্য নূতন। রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী নাটকে এই আদিকালের বুড়োর নিত্য নূতন হওয়ার কথাই রহিয়াছে। যুবকের দল যখন ছুটিল সেই আদিকালের বুড়োর সন্ধানে, তিনি তখন গুহার ভিতর হইতে বাহির হইলেন নবীন রূপে। তিনি যুগে যুগে নিত্য নবীন রূপে আসেন।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাই নিত্য নবীন মদন; এই কামনা-বহুল বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তিনি নিত্য নূতনরূপে সকলের দাবী পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনিই মাত্র বলিতে পারেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"—। যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমিও তাহাকে সেই ভাবে ভজনা করি। ঐতিহাসিক সত্যরূপে কি বিশ্বরূপ জীবন ছিল তাঁহার! একজন মানুষ হইয়া তিনি সকলের দাবী পূরণ করিয়াছিলেন অথচ কোথাও ধরা পড়েন নাই। সকলের হইয়াও তিনি ছিলেন সকলের অধররূপে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তো আর কেহ হইতে পারিবে না। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভাবাপন্ন অনেক ভক্ত মহাপুরুষ আছেন তাহাদিগকেও ভগবান বলা হয়। মুনি ঋষিদিগকেও ভগবান বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে, তাহা তো জান? তাই বলিয়া তাঁহারা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান নহেন। আলো সূর্য্যের, তাপ সূর্য্যের; কিন্তু সূর্য্যের রশ্মি সেই তাপ ও আলো বহন করিয়া আনিয়া জগৎকে আলোকিত করে, তাপিত করে। তেমনি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও তত্ত্ব পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেরই; ভক্তজীবন তাহার মাঝে অবগাহন করিয়া, সেই ভাবে ভাবিত হইয়া জগতের বুকে সেই ভাবধারাকে বহন করিয়া আনে। অনুমান ও প্রত্যক্ষ-সমন্বিত জীবন যাঁহার, তিনিই পুরুষোত্তম মানুষ এবং তিনিই প্রকৃত গুরু হইবার অধিকারী।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে কেহ তো এখন এই বিশ্বে প্রকটরূপে পাইবেন না; এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন যাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ, এমন মানুষই বর্ত্তমান যুগের সমস্যা সমাধানের যোগ্য। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাঁহার যোগ রহিয়াছে এবং ঐ যোগ থাকার দরুণ যাঁহার জীবনে স্বরূপ-বিশ্বরূপ সমন্বয় করিবার যোগ্যতা লাভ হইয়াছে, তিনিই বর্ত্তমান যুগসমস্যার সম্মুখে দাঁড়াইতে সমর্থ। প্রত্যেক মানুষেরই পুরুষোত্তম হইবার যোগ্যতা আছে; কেননা প্রত্যেক

মানুষের ভিতরই স্বরূপ এবং বিশ্বরূপ-সমন্বিত সত্তা রহিয়াছে। মানুষ স্বরূপে এক, বিশ্বরূপে বহু। মানব জীবন এই স্বরূপ-বিশ্বরূপে সমন্বিত বলিয়াই তাহার নিত্য নূতন হইবার যোগ্যতা। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে কি ইহা বুঝা যায় না? প্রতি মানুষ ভাবে ও রূপে বহু। মায়ের নিকট মানুষ থাকে সন্তান ভাব লইয়া সন্তানরূপে; আবার যখন সেই মানুষই স্ত্রীর নিকট যায়, তখন সে স্বামীভাবাপন্ন; তাহার রূপও তখন অন্য প্রকার। সে-ই যখন নিজের সন্তানকে বুকে লয়, তখন সে পিতৃভাবাপন্ন। ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চোখ-মুখের চেহারা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপে মানুষের ভিতর অনন্ত ভাব ও মূর্ত্তি রহিয়াছে, যাহা প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়াই চলিয়াছে। যাহার জীবন যত ব্যাপক, তাহার বিশ্বরূপ-জীবন তত পরিস্ফুট। প্রতি অণুরও যে বিশ্বরূপ হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে, ইহাই তো গীতার বিশ্বরূপদর্শনের তাৎপর্য্য। বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে যাহার জীবন যত ব্যাপক, তাহার জীবনে ঘটনাও তত বেশী। যে জীবনে প্রতি ঘটনা সেই সেই ঘটনারূপেই হজম হইয়া যাইতেছে, কোন একটিতেই আটকাইয়া অগ্রগমনে বাধা জন্মাইতেছে না, সেই বিশ্বরূপ-জীবনই মুক্ত। এই ঐতিহাসিক বিশ্বরূপ-জীবনই পুরুষোত্তমজীবন।

মানুষ এই জীবনের পথে যতখানি অগ্রসর হয়, সে ততখানিই পুরুষোত্তম মানুষ। এই বিশ্বের সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াও যে মানুষ মুক্ত থাকিতে পারে, সেই মুক্ত মানুষ গড়িবার শাস্ত্রই পুরুষোত্তমশাস্ত্র। বর্ত্তমান জগতে গুরুরা যদি পুরুষোত্তম মানুষ হইতেন, তাহা হইলে শিষ্য লইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না, শিষ্যদেরও গুরু লইয়া বিপদে পড়িতে হইত না। স্বামী যদি এই পুরুষোত্তমজীবন লাভ করিতেন, পিতা যদি এই পুরুষোত্তমজীবন লাভ করিতেন, তাহা হইলে কি পরিবার জীবনের শৃঙ্খলা এমন করিয়া ভাঙ্গিতে পারিত? রাজা যদি এই পুরুষোত্তম-জীবন লাভ করিতেন, রাজ্য কি এমন বিদ্রোহী রূপ ধরিতে পারিত?

মানুষের জীবনের সকল স্তর যেখানে তৃপ্ত, সেইখানেই হয় মিলন; বিদ্রোহ তখন আর থাকিতে পারে না। শোষিত হয় বলিয়াই তাহারা বিদ্রোহ করে।

স্মৃতি—ব্রজলীলার সহিত বর্ত্তমান যুগের যে সংযোগ কোথায়, তাহা কিছু কিছু বুঝিলাম বটে। কিন্তু মনের ভিতর একটা প্রশ্ন যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—এ যুগের শোষিতেরা পুরুষোত্তম মানুষ কোথায় পাইতেছে? পাইলেই বা চিনিবার মত বুদ্ধি তাহাদের কই?

শ্রুতি—আমি তো বলিয়াছি গতিযুক্ত আদর্শই পুরুষোত্তমের স্বরূপ। আদর্শ-নিষ্ঠা থাকিলে আদর্শই একদিন মূর্ত্ত হইয়া ধরা দেয় বিশ্বরূপ-রূপে জীবনের কাছে। পুরুষোত্তম মানুষ বিশ্বে প্রত্যক্ষ আছেনই; তাহা না হইলে এই বর্ত্তমান আন্দোলন স্ফুরিতই হইতে পারিত না। আজ তাঁহাকে তুমি দেখিতে পাইতেছ না বটে; কিন্তু তাঁহাকে বুঝিবার ও জীবনে গ্রহণ করিবার সাধনা লইয়া বসিয়া থাকিলে একদিন তোমার জীবনেও তিনি মূর্ত্ত হইয়া ধরা দিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিনা সাধনায় কেহ কখন কাহাকেও পায় নাই। পুরুষোত্তমকে পাইয়া পুরুষোত্তমজীবন লাভ করিতে হইলে দৃঢ়তার সহিত নিজের ভিতরের আদর্শকে জমাইয়া ঘন করিয়া তুলিতে হইবে, অপরের ভিতর সেই আদর্শের প্রেরণা দিয়া নারীসংঘ রচনা করিতে হইবে। যে আদর্শের টানের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন না হইয়া মেয়েরা ঘর ছাড়িল, সেই আদর্শবোধ যদি তাহাদের ভিতর জাগরিত হয়, তবে তাহারা সকল দ্বন্দ্ব ভুলিয়া একত্র হইতে পারিবে; তখন সেই আদর্শ নারী সংঘের ধাক্কায় গড়িয়া উঠিবে উত্তম-পুরুষ, আদর্শবান পুরুষ। আদর্শবতী নারী ও আদর্শবান পুরুষের প্রাণখোলা মিলনের উপরেই গড়িতে হইবে ভবিষ্যৎ সমাজ। পুরুষোত্তম আছেন, আসিবেন। চিনিবার মত বুদ্ধিও মেয়েদের আদর্শই তাহাদের দান করিবে। প্রথমে মেয়েদিগকে কেন কোন্ পথ অবলম্বন

করিয়া জীবনপথের যাত্রা সুরু করিতে হইবে, তাহাই বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন ; তাহার পর তাহাদের পথই গন্তব্য স্থলকে গড়িয়া তুলিবে।

স্মৃতি—বর্ত্তমান যুগে পুরুষোত্তম মানুষ পাওয়া তো খুবই কঠিন। মেয়েদের যদি আদর্শ-বোধ আসে, আর সেই আদর্শের টানে নারী-সংঘ গড়িয়াই তুলিতে পারে, তাহা হইলে প্রয়োজনই বা কি বাহিরের কোনও পুরুষোত্তমকে পাওয়ার ? তুমি তো বলিয়াছ মানুষ নিজের মাঝেই নিজে স্বয়ংপূর্ণ, তখন আর অন্য মানুষের কি প্রয়োজন আছে ?

শ্রুতি—এখানে আবার ভুল করিতেছ, স্মৃতি। মানুষ নিজের মাঝেই নিজে পূর্ণ—পরিপূর্ণ সত্যের ইহা একটি দিক। প্রতি খণ্ড পূর্ণ মানুষের বাহিরেও একটি অখণ্ড সমগ্র তত্ত্ব রহিয়া গিয়াছে—ইহাও তাহার জীবনের অপর দিক। সকল খণ্ড পূর্ণ মানুষ যখন হাত ধরা-ধরি করিয়া দাঁড়াইতে পারে, তখনই সেই অখণ্ড সমগ্রকে মানুষ ধরিতে পারে। তাহা না হইলে খণ্ড-মানুষের কাছে সেই অখণ্ড একেবারেই অধরা হইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যে সেই অখণ্ডের স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব আছে বলিয়াই মানুষের মধ্যে বড় হইবার ক্ষুধা, সর্ব্বখণ্ডের সমন্বয়ে বাস্তবের দেশে অখণ্ডকে পাইবার খোঁচাও রহিয়াছে। মানুষকে বড় হইতে হইলে, অখণ্ডকে পাইতে হইলে, অপর খণ্ডের সঙ্গে তাহাকে মিলিতেই হইবে। মানুষের মধ্যে যদি এই অখণ্ডের সত্তা অনাদি হইতে অনন্তে না থাকিত, তবে অন্য মানুষের সহিত মিলন তাহার পক্ষে সম্ভবই হইত না। এই মিলন দুইভাবে হইতে পারে। প্রথমতঃ খণ্ড ৩ ও খণ্ড ৫ তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষত্ব না খোয়াইয়া মিলিতে পারে অখণ্ড ১৫-এর মধ্যে ; এই ১৫ই পুরুষোত্তমবস্তু। দ্বিতীয়তঃ প্রতি মানুষের মধ্যে স্বয়ংপূর্ণ একটী অখণ্ডত্বও আছে, কিন্তু সে তাহার বিশেষত্বকে বাদ দিয়া ; যেমন অখণ্ড ১এর মাঝে খণ্ড ৩ ও খণ্ড ৫ নিজ নিজ বিশেষত্ব বাদ দিয়া এক অখণ্ড হইতে পারে। যদি বিশেষত্বকে রাখিতে চাই, বিশেষত্বকে রাখিয়া অন্য খণ্ডের সঙ্গে মিলিতে চাই,

এবং অখণ্ডের উপলব্ধির আশাও রাখি, তবে আমাদের পুরুষোত্তম-বস্তু ঐ ১৫-এর শরণাপন্ন হইতেই হইবে। ইহা ব্যতীত খণ্ডের সংঘ গড়া সম্ভবই নয়। খণ্ড মানুষ স্বয়ংপূর্ণ বটে, কিন্তু তাহার ভিতর একটী অখণ্ড নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব লুকাইয়া রহিয়াছে বলিয়াই অপর খণ্ডের সহিত যুক্ত হইবার ব্যাকুলতা তাহার পক্ষে অনিবার্য্য হইতেছে।

মানুষ যে অনন্ত; তাহার সেই বড় হইবার ক্ষুধা কে মিটাইবে? একটি খণ্ড স্বয়ংপূর্ণ মানুষ প্রতি অন্য এক খণ্ডের ভিতর যতখানি রহিয়াছে, ততখানিই সে অপর খণ্ডকে আস্বাদন করিতে পারিবে। তাহার বাহিরেও যে অনন্ত বিশ্ব পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার আস্বাদন করিবে কি করিয়া? কোনও খণ্ড বিশেষত্ব অপর খণ্ড বিশেষত্বের ভিতর পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। মানুষ তো শুধু বর্ত্তমান জীবনটুকু লইয়াই নয়, জীবনের অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ মিলাইয়াই সে একটী পরিপূর্ণ মানুষ। এই অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ যাহার জীবনে যত প্রত্যক্ষ, সেই পুরুষোত্তম মানুষের ভিতরেই অন্য খণ্ডগুলি তত হাত ধরা-ধরি করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে পারে। অখণ্ড নির্ব্বিশেষের স্পর্শ ব্যতীত সমস্ত খণ্ড বিশেষ একত্র মিলিতেই পারে না। এই জন্যই সর্ব্ববিশেষত্বঘন নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের প্রয়োজন রহিয়াছে, যাহার ভিতর ডুবিয়া সকল বিশেষত্বগুলি প্রত্যেকের প্রতি অঙ্গের কান্না জুড়াইতে পারে। ত্রিকালে অবাধগতি পুরুষোত্তম মানুষ ব্যতীত কেহ কি খণ্ডের সংঘ গড়িতে পারিবে? বিশ্বের সকল স্ত্রী-পুরুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ আদি সকলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে মিলাইয়া পরস্পর পরস্পরের হাত ধরা-ধরি করিয়া দাঁড়াইবে এবং যে যাহার ছন্দ বজায় রাখিয়া অন্যের প্রকাশের পথ খুলিয়া দিবে, এইরূপ আশা ও বিশ্বাস তত্ত্বদৃষ্টিতেই সম্ভব; কিন্তু ব্যবহারিক এই বাস্তব বিশ্বে ইহা তো কোনও দিনই ষোল আনা বাস্তবে পরিণত হইবে না। এই তত্ত্বকে শুধু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঘন করিতে করিতে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রকে জয় করিতে করিতে

আগাইয়া চলিতে হইবে। কোনও দিন একান্তভাবে এই তত্ত্ব বাস্তবকে হজম করিবে, এ আশা পাগলের খেয়াল মাত্র। অথচ হজম করিবার জন্য ছুটিয়াও চলিতে হইবে অনন্ত ধৈর্য্য, আশা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে বুকে লইয়া, বেদনাময় জীবন লইয়া। সেইজন্যই তো ১৫-এর, সেই পুরুষোত্তমবস্তুটীর প্রয়োজন রহিয়াই যাইতেছে। ১৫-এর, সেই পুরুষোত্তমবস্তুটির স্থলাভিষিক্ত হইতেছেন বাস্তবের দেশে রাজা, গুরু ও সংঘ কর্ত্তা।

স্মৃতি—তুমি যে আত্মসমর্পণের কথা বলিতেছ, বর্ত্তমান সময়ে ছেলে মেয়েরা কেহই তো বড় কাহাকেও মানিয়া চলিতে চাহে না; আত্মসমর্পণের কথা তাহারা শুনিতেই পারে না, প্রত্যেকেই চায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য লইয়া চলিতে।

শ্রুতি—ইহা ঠিক কথা নয় স্মৃতি। নানা স্থানে নানা রূপে প্রত্যেকেই আত্মসমর্পণ করিয়া রহিয়াছে। ব্যষ্টিমাত্রই সমষ্টির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া চলিয়াছে। কংগ্রেসীরা ভারতবর্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, কম্যুনিষ্টরা লেলিন ও রাশিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছে। ব্যাপক যে কোনও আদর্শের নিকটই মানুষ আত্মসমর্পণ করে তাহা জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক। সমুদ্রের কাছে আত্ম-সমর্পণেই নদীর জীবন। নদী সমুদ্রে আত্মসমর্পণ করিয়াই জীবন্ত তাজা। মানুষের ক্ষুদ্র আমি বৃহতের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই আজ তাহার জীবন বিচ্ছিন্ন, শুষ্ক এবং মলিন। নদীর সহিত সাগরের মিলনের পথে যে বাধা, ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবার নামই আত্মসমর্পণ। গঙ্গাসাগরসঙ্গম তাই মহান তীর্থ—কখনও গঙ্গার বুকে সাগর, কখনও সাগরের বুকে গঙ্গা। প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যলাভ করিবার জন্যই আদর্শবান মানুষের নিকট আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আত্মসমর্পণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খোয়া তো যায়ই না, বরং তাহা বিকাশ ও প্রকাশ লাভ করিতে সাহায্যই পায়। আত্মসমর্পণের অর্থ নিজের বিশেষত্বকে

নষ্ট করা নয়; নিজের যে সংকীর্ণতা, যে অহংকার বৃহতের সঙ্গে যোগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, যাহা মানুষের একটি স্বভাব, সেই বিচ্ছিন্নতাকে মুক্ত করিয়া দেওয়াই, সমগ্রের বোধ জাগ্রত করাই আত্মসমর্পণের গূঢ় প্রয়োজন। আত্মসমর্পণ করিতে হইতেছে সকলকেই, স্বীকার করে না শুধু মুখে। এই আত্মসমর্পণ যদি বিকৃত আত্মসমর্পণ না হইয়া যোগ্য স্থান বুঝিয়া হইত, তাহা হইলে মানুষ সার্থক হইতে পারিত। অর্জ্জুনের পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণই তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। রামদাসের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াই শিবাজী সার্থক হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট আত্মসমর্পণের উজ্জ্বল আদর্শই বিবেকানন্দ। আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়া আত্মার সঙ্কুচিত অবস্থারই নির্ব্বাণ লাভ হয়। আত্মসমর্পণই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-লাভের মূল রহস্য।

স্মৃতি—তুমি যে বলিলে অনুমান ও প্রত্যক্ষ-সমন্বিত জীবন যাঁহার, তিনিই পুরুষোত্তম মানুষ এবং তিনিই ঐতিহাসিকরূপে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। সে তো দ্বাপর যুগের কথা। বর্ত্তমানে কৃষ্ণ-জীবনও তো আনুমানিক হইয়াই পড়িয়াছে। আনুমানিক কৃষ্ণ-জীবন যদি বর্ত্তমানে কোন পুরুষের ভিতর প্রত্যক্ষ হইত, তবেই না বর্ত্তমান যুগ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিত?

শ্রুতি—আনুমানিক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনই বর্ত্তমান যুগে যুগ-সমস্যার সমাধানরূপ পুরুষোত্তমদর্শন দান করিবার জন্য ধরায় অবতরণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়রস আস্বাদন করিতে দ্বাপরের শেষভাগে যশোদাদুলাল কৃষ্ণগোপাল বৃন্দাবনে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনিই আবার সেই ব্রহ্ম ও মায়ার সমন্বয়তত্ত্ব জগতের বুকে ছড়াইয়া দিবার জন্য কলিকলুষনাশন শচীর দুলাল গৌরগোপালরূপে নদীয়ায় অবতরণ করিয়াছিলেন। পুনরায় ব্রহ্ম এবং মায়ার সেই সমন্বয়তত্ত্বকেই পরিপূর্ণ রূপে জগতকে আস্বাদন করাইবার জন্য বর্ত্তমানে যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক

গৌরীদুলাল শ্রীনিত্যগোপাল পানিহাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি জ্ঞানানন্দ, তিনি নিত্যগোপাল। তিনি নিত্যসত্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপী জ্ঞানানন্দ। আবার তিনিই এই গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বিশ্ব পালনকারী, তাই তিনি গোপাল; অথচ তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনি নিত্য। নিত্য ও অনিত্য এবং ব্রহ্ম ও মায়ার সমন্বয়মূর্ত্তিই শ্রীনিত্যগোপাল। পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের দেওয়া শাস্ত্র ও জীবনদর্শনই পুরুষোত্তমদর্শন। এই পুরুষোত্তমদর্শনের আলোতেই বর্ত্তমান যুগ-সমস্যার সমাধান খুঁজিতে হইবে।

স্মৃতি—আচ্ছা ভাই, তুমি যে স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্যের কথা বলিতেছ, তাহা কি বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতাই এদেশে আনিয়া দেয় নাই? তুমি দ্বাপর যুগের রাধাকৃষ্ণকে লইয়া টানাটানি করিতেছ কেন?

শ্রুতি—পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশে স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্যের একটা ব্যাপক আন্দোলন আনিয়াছে একথা খুবই সত্য; কিন্তু ভারতের স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্য প্রথমে ঘোষণা করিয়াছেন ভারতেরই ইতিহাস-প্রসিদ্ধা নারী বিপ্লবময়ী রাধারাণী। ভারতের বর্ত্তমান নারীপ্রগতির আদর্শও তিনিই। রাধাচরিত্র যদি ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষে প্রকট না হইত, নারীচরিত্রে একটী বিরাট অপূর্ণতা রহিয়া যাইত। এই নারীপ্রগতির যুগে বিশ্বদরবারে উপহার দিবার মত ভারতবর্ষের কোনও চরিত্র থাকিত না। রাধাই ভারতের শেষ নারীচরিত্র, সীতা সাবিত্রী নন। সীতাসাবিত্রীচরিত্রের ক্রমপরিণতিই রাধা। নারীজীবনের সব বেদনা ও তাহার প্রতিবাদের মূর্ত্ত বিগ্রহই রাধা। রাধা শুধু দেবীই নন্; ভাবুকরসিক বাঙ্গালীর চোখে তিনি শুধুই মানবী। ভারতবর্ষে যদি আর সব গ্রন্থ মুছিয়াও যায়, একমাত্র ভাগবত ও রাধাকৃষ্ণ বাঁচিয়া থাকেন, তবে লক্ষ বৎসর পরেও বিশ্ব বুঝিতে পারিবে সভ্যতার কোন্ উচ্চতম শিখরে সে আরোহণ করিযাছিল।

ইংরেজ শাসন যখন এদেশে কায়েম হইল, তখন গতিশীল পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা প্লাবন আসিয়া স্থিতিশীল ভারতবর্ষের

সভ্যতার মূলে আঘাত করিল। দীর্ঘদিনের দিদিমা, ঠাকুমাদের পূর্ব্ব ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া মেয়েদের ঘরের বাহিরে টানিয়া বাহির করাই পাশ্চাত্য সভ্যতার কৃতিত্ব। সেই সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হওয়ায় ব্রাহ্ম মেয়েরা স্কুলকলেজে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করে। মেয়েদের শিক্ষা কিংবা স্বাধীনতার সত্য প্রয়োজনবোধ ব্যাপকভাবে জাগরিত হওয়া অপেক্ষা আবেষ্টনগত চাপই তাহাদিগকে পথে বাহির করিয়াছে। সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্যের কৃচ্ছ্রচ্ছতাও এই আবেষ্টনগত চাপের অন্যতম একটি প্রধান কারণ। তাই আইনের শাসনে সতীদাহের বাহিরের রূপটা বদলাইল বটে, কিন্তু ভিতরের জ্বালা নিভিল না। মেয়েদের ঘরের বাঁধ কেন যে টুটিল, তাহার কারণ যেমন মেয়েরাও জানে না তেমনি সমাজপতিরাও সে সম্বন্ধে সচেতন নন। পাশ্চাত্যের অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া উচিত, "অতএব" শিক্ষায়তন সৃষ্টি হইল। কিন্তু পাশ্চাত্যের সমাজকাঠামো আর ভারতবর্ষের সমাজকাঠামো তো একেবারেই এক নয়। তাই তাহাদের নজির দেখাইয়া "অতএব"—এর সিদ্ধান্ত লইলে তাহা আমাদের দেশে খাপ খাইবে কেন? যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণার ফলে ঘটিয়াছে, তাহাকেই আজ সচেতন ভাবে বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে, তাহার স্বস্থ ব্যবস্থাকে বাহির করিয়া লইয়া শাস্ত্রের মধ্যে তাহাকে রূপ দিতে হইবে। তাহা না হইলে রাস্তায় বাহির হইয়া মেয়েরাও শান্তি পাইতেছে না, সমাজের স্বাস্থ্যও টিকিতেছে না।

যাঁহারা তথাকথিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারাই কি জানেন তাঁহারা কি চান, পূর্ব্বে তাঁহাদের অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল কেন এবং এখন তাঁহারা সে ব্যবস্থা কেনই বা মানে না, এবং তাঁহাদের ভবিষ্যৎই বা কি? শতকরা ২।৪টি মেয়ে ছাড়া সকলেই গড্ডালিকাস্রোতে পড়িয়া লেখাপড়া গীতবাদ্যনাচ শেখে, তাহার পর বাপের টাকা থাকিলে বিবাহ করে, নয় তো এটা-ওটা করিয়া দিন

যাপন করে। ভগবানের কৃপায় রাষ্ট্রের ক্ষেত্র তাহাদিগকে আহ্বান করায় তাহাদের তবু একটি স্থান জুটিয়াছে। কিন্তু সমাজব্যবস্থার মূল বদলাইতে না পারিলে, নারীপুরুষের স্থান ও মান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা মূলে না বদলাইলে সমাজের স্বস্থ হওয়ার কোন উপায় নাই। যে পরিবর্ত্তনের চেহারা দেখা যাইতেছে, তাহাও তো কয়েকটি শহরের। ভারতবর্ষে সাত লক্ষ গ্রাম। এখনও এই সকল গ্রামে লক্ষ লক্ষ মেয়েরা অশিক্ষিত অবস্থায় যে অন্ধকারে জীবন যাপন করিতেছে, তাহার বর্ণনা প্রয়োজনহীন। পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহাদের আলোর সন্ধান দিতে পারে নাই। আজও সেখানে কোন অনুকূল অবস্থাই গড়িয়া উঠে নাই। দীর্ঘ দিনের ব্যবস্থা ও পরাধীনতা মেয়েদের এমন অসহায়, অক্ষম করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহাদের আর মানুষ নাম দেওয়া চলে না।

নারী-প্রগতিকে সার্থক করিতে হইলে ভারতের অতীত আদর্শের ভিত্তির উপর নবীনের সৌধ গড়িতে হইবে। ভারতীয় সভ্যতাকে ভারতের শাস্ত্রের ভিতর দিয়া দুঃখী নারী-সমাজের নিকট পৌছাইতে হইবে। সীতার একনিষ্ঠার উপর, আদর্শের উপর স্থিত হইয়াই রাধার বহুর ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার যোগ্যতা। শ্রীরাধা গতির মূর্ত্ত বিগ্রহ। ভারতবর্ষের মেয়েদিগকে সীতাজীবনেরই অপরাংশ হিসাবে রাধাজীবনকে স্বীকার করিতে হইবে। এই স্থিতিগতি মিলিয়া যে নারী-প্রগতি, তাহাই ভারতের নারী-প্রগতি। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের মেয়েদিগকে এই স্থিতি-গতিসমন্বিত প্রগতি বুঝিয়া লইয়া সেই পথে চলিতে হইবে। এই নারী-প্রগতি সফল হইবে পুরুষোত্তমকে কেন্দ্র করিয়াই। পাশ্চাত্য নারী প্রগতির ভিতরে পুরুষোত্তমের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। মনে হয় যেন, যে-কোনও পুরুষকে কেন্দ্র করিয়াই পাশ্চাত্যের নারী-প্রগতি সার্থক হইতে পারে। কেননা তাহাদের সভ্যতার ভিতর স্থিতি অপেক্ষা গতির দিকটাই প্রধানভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের সভ্যতার ভিতর স্থিতি-গতিসমন্বিত পুরুষোত্তমের জীবনদর্শন

রহিয়াছে। ভারতের নারী-প্রগতি তাই পুরুষোত্তমকে কেন্দ্র করিয়াই সত্য বাস্তব। সমাজের পুরুষ ও নারী যখন পুরুষোত্তমভাবাপন্ন হইবে, তখনই নারী-প্রগতির উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিবে। পৌরুষহীন নারী-পুরুষের যে প্রগতি, তাহা কিছুদূর যাইয়া আটকাইয়া যাইবে এবং বর্ত্তমানের চেয়েও বীভৎস প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে। একমাত্র পুরুষোত্তমস্তরেই প্রগতি অবাধ ও অব্যাহত, এবং এই স্তরেই দুই দুইকে সৃষ্টি করে।

স্মৃতি—আচ্ছা, যদি স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য শাস্ত্রের ভিতর দিয়া না দিয়া রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া দেওয়া যায়, তাহাতে কি স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করা যাইবে না?

শ্রুতি—বর্ত্তমানকালে শাস্ত্র এবং রাষ্ট্র পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্যই আজ তুমি এ প্রশ্ন তুলিতেছ। পূর্ব্বের শাস্ত্রকর্ত্তারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই শাস্ত্রের ভিতর দিয়া দিতেন। আজকাল আর তাহা নাই; জীবন এখন খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এসেমব্লীর ব্যবস্থা হইতে বাধ্য-বাধকতাপূর্ণ আইন পাশ করিয়া যদি কোন স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা হইবে যান্ত্রিক স্বাধীনতা, যান্ত্রিক সভ্যতা। এই যান্ত্রিক সভ্যতাই বর্ত্তমানে চলিতেছে। জীবন্ত ধর্ম্মের আইন গড়িয়া উঠে প্রাণের ভিতর দিয়া সহজ জীবনের সহজ স্বাধীনতার উপর। স্বামীস্ত্রীর সহজ জীবনের চলার পথে যোল আনাই যদি রাষ্ট্রের আইন-ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হয়, তাহা কি অশোভনীয়, অমর্য্যাদাপূর্ণ হয় না? রাষ্ট্রের যতটুকু করিবার আছে, সে তাহা করিবে। তাহার পরেও যদি শাস্ত্র-নিহিত ভিত্তিমূলের চিন্তাধারা বদলান না যায়, তবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থারও কোন যৌক্তিকতা থাকিবে না, উহার ভিত্তিও দৃঢ় হইবে না। সমস্ত পরিবর্ত্তনের অন্তর্নিহিত চিন্তাধারাটা বদলানও সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন। শাস্ত্রের ভিতর দিয়া নারীজাতির নিজস্ব অধিকার ঐ স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্য যেদিন ঘোষিত হইবে, এবং নারী তাহাকে নিজ চিন্তাধারার ভিতর দিয়া আয়ত্ত করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবে, সেইদিন নারী পাইবে তাহার রাষ্ট্র ব্যবস্থার

দ্বারা প্রদত্ত সত্য অধিকার, তাহার সত্য সম্মান। কেবল বাহির হইতে আইন-করা ব্যবস্থায় জীবনের পুরাপুরি মীমাংসা হয় না।

স্মৃতি—সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য পুরুষদের একপত্নীব্রত, নারীদের একপতিব্রত বর্ত্তমানে সকলের কাছে আদরণীয় হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়। নারীপ্রগতির দ্বারা এই ব্রত কি রক্ষিত হইবে?

শ্রুতি—নারীপ্রগতির প্রথম ও প্রধান অর্থ হইতেছে পুরুষের ন্যায় নারীরও স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার স্বীকারের ভিত্তিতে একটি সমগ্র অখণ্ড সমাজ সৃষ্টি করা। ইহার সঙ্গে মানুষের প্রকৃতির মূলে বহুকে আস্বাদন করিবার যে আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, সে প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। প্রত্যেক নারী-পুরুষের ভিতরই বহুকে আস্বাদন করিবার একটি খোঁচা আছে, যেমন আছে এককে আস্বাদন করিবার। বহুকে আস্বাদন করার অর্থ বহু দেহকে অবলম্বন করাই নয়; বহু যোগ্যতাকে আস্বাদন করা, বহু প্রকাশকে আস্বাদন করাই বহুকে আস্বাদন। একের ভিতর বহু-দিক থাকিলে, বহু প্রকাশ থাকিলে, এককে লইয়াই বহুর আস্বাদন সার্থক করা যায়। নারী-প্রগতি আজ নারী পুরুষকে সর্ব্বক্ষেত্রের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার প্রেরণাই যোগাইতেছে। পুরুষোত্তমস্তরে যাহা 'এক', তাহা এক ও বহুর সমন্বয়। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীই একাধারে এক ও বহু হইয়াই একপতি বা একপত্নী হইবেন। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এক ও বহুর সমন্বয় থাকায়, একান্ত এক বা একান্ত বহু লইয়া কাহারও খোঁচা মিটিতে পারে না। একান্ত এককে লইয়া থাকিলে জীবনের গতি মন্থর হইতে হইতে শেষে আটকাইয়া যাইবে; পক্ষান্তরে একান্ত বহুকে লইয়া থাকিলেও জীবনে আসিবে স্থিতিহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা; যাহার পরিণাম ফল হইবে সমাজের ভিতরে নারী-পুরুষ লইয়া পারস্পরিক কাড়াকাড়ি। অথচ একান্ত এক-পতি ও একান্ত একপত্নী হইয়া, পতির একপতিত্বের এবং পত্নীর একপত্নীত্বের আকাঙ্ক্ষাও মিটিতে পারে না।

পুরুষ যদি পুরুষোত্তমজীবন লাভ করে, এবং নারীও যদি পুং
লাভ করে, তখনই তাহাদের মিলনের ভিতর থাকিবে এক ও বহু .
পতির জীবনে বিশ্বরূপ জীবন থাকায়, তাহার সর্ব্বক্ষেত্রে দাঁড়াইবার উপযোগী বহুমুখীন প্রতিভা থাকায়, নিত্য নব নব জীবনলাভের যোগ্যতা থাকায় এক পতি লইয়াই পত্নীর একপতিত্ব ও বহুপতিত্বের আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। সেইরূপ নারীজীবনেও বিশ্বরূপ থাকায়, এক ও বহুসমন্বিত পুরুষোত্তমজীবন থাকায়, এক পত্নী লইয়াই পতির একপত্নী ও বহুপত্নী পাওয়ার সাধ পূর্ণ হইবে। পুরুষোত্তম নারী ও পুরুষোত্তম পুরুষের মিলনেই প্রগতি অব্যাহত থাকিবে। শরৎচন্দ্রের "শেষ প্রশ্নে" কমলের যে বহু পতির উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা শুধু এইটাই দেখাইবার জন্ম যে, নারী-প্রকৃতির মাঝেও বহু পুরুষ পাইবার একটি সনাতন খোঁচা রহিয়াছে, যাহাকে একপতিব্রত দ্বারা দাবাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না। তাহা হইলে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, নারী অসংখ্য পুরুষের সঙ্গে মিলিত হইয়াই তাহার প্রগতির খোঁচাকে সার্থক করিবে? পুরুষোত্তম-দর্শন বলিবে যে, এইভাবে অসংখ্য পুরুষের সহিত মিলিত হওয়াও তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা তাহার জীবনে যে একের দিকের খোঁচাও তুল্য ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। একত্বহীন অসংখ্যের সঙ্গে তাহার মিলন দেহের দিক হইতেও যেমন অসম্ভব, মনের দিক হইতেও সেইরূপ অসম্ভব ও অশুচি। একজন পুরুষ বা নারী দেহ দিয়া কয়জনের সহিত মিলিত হইতে পারে?

"এক" যোগায় স্থিতি, "বহু" যোগায় রস; বহুসমন্বিত একই নিতুই নব নব। প্রকৃতির অন্তরে এই এক ও বহুর সমন্বয় আছে বলিয়াই কোন যুগের সমাজব্যবস্থায় এক পুরুষের বহু নারীর পাণি-গ্রহণ, কখনও বা এক নারীর বহু পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত হইবার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সে সমাজ উহাতে উচ্ছৃঙ্খলও হয় নাই, অপবিত্রও হয় নাই। নমনধর্ম্মশীল পুরুষোত্তমজীবন যে সমাজের আদর্শ, সেই জীবন্ত

সমাজের তাৎকালিক আবেষ্টনের মধ্যে এক পুরুষের বহু পত্নী এবং বহু পুরুষের এক পত্নী গ্রহণের অবকাশ নিশ্চয়ই থাকিবে। তবে মনে হয়, মানুষের প্রকৃতির ক্রমবিবর্ত্তনের ঝোঁক একপতি বা একপত্নী গ্রহণ করার দিকেই এবং বর্ত্তমানে ইহাই সাধারণ নিয়ম।

স্মৃতি—ভাই, তোমার কথা শুনিয়া আর একটা প্রশ্ন মনে উঠিতেছে, শ্রীরাধা এবং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক তো পরকীয় সম্পর্ক। এই সম্পর্কটীকে সমাজ জীবনে, পরিবারের ভিতর কিরূপে হজম করিবে বুঝাইয়া বল না?

শ্রুতি—তোমরা পরকীয় সম্পর্কটাকে যেরূপে বুঝিয়াছ, উহা তো পরকীয় শব্দের নিগূঢ় অর্থ নহে। মানুষ যখন নিজকে ভোক্তারূপে সাজাইয়া অপরকে ভোগ্যরূপে ভোগ করে তখন ভোগ্য হয় ভোক্তার স্বকীয়। তখন ভোগ্যের নিজস্ব কোনও সত্তা থাকে না, কর্তৃত্ব থাকে না; ভোগ্য হয় ভোক্তার সম্পূর্ণ অধীন। আর ভোক্তা-ভোগ্য যখন উভয়ে স্বাধীনভাবে থাকিয়া শুধু ভালবাসার ভিতর দিয়া উভয়ে উভয়কে ভোগ করে, তখনই সে সম্বন্ধ পরকীয়। সবদিক দিয়া সম্পূর্ণ নিজের করিয়া না-রাখিয়া স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া-রাখিয়া যে পাওয়া, তাহাই পরকীয়রূপে পাওয়া। রবীন্দ্রনাথ এই কথাই লিখিয়াছেন—

সংসারেতে আর যাহারা আমায় ভালবাসে,
তারা আমায় ধরে রাখে বেঁধে কঠিন পাশে,
তোমার প্রেম যে সবার বাড়া, তাই তোমার এই নূতন ধারা
বাঁধনাকো লুকিয়ে থাক, ছেড়েই রাখ দাসে।

কঠিন পাশে বাঁধিয়া রাখিয়া ভালবাসাই স্বকীয়; আর ছাড়িয়া রাখিয়া ভালবাসাই পরকীয়। এই ছাড়িয়া-রাখিয়া ভালবাসার ভিতর দিয়াই মানুষ সবাইকে সত্য সার্থক করিয়া পায়—স্বামী স্ত্রীকে পায়, পিতা পুত্রকে পায়, গুরু শিষ্যকে পায়, রাজা প্রজাকে পায়। একান্ত

স্বকীয়রূপে, ভোক্তারূপে পাইতে যাইয়া পুরুষ আজ স্ত্রীকে পাইতেছে না, পিতা আজ পুত্রকে পাইতেছে না, গুরু আজ শিষ্যকে পাইতেছে না, রাজা আজ প্রজাকে পাইতেছে না। ইংরেজ আইনের পাশে ভারতবর্ষকে বাঁধিয়া রাখিতে যাইয়া আজ আর ভারতকে পাইতেছে না। যদি ছাড়িয়া-রাখিয়া ভারতবর্ষকে পাইতে চাহিত, তাহা হইলে সেই ছাড়িয়া-রাখার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষকে সে পাইত। সবাই আজ কঠিন পাশের বাঁধন ছিঁড়িয়া মুক্ত হইবার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। পরকীয় শব্দের বিকৃত অর্থই আজ সমাজে চলিতেছে।

প্রত্যেক মানুষ যে নিজের কাছেও নিজে পরকীয়। স্ত্রী যখন শুধু স্বামীরই, তখন সে স্বামীর ও নিজের কাছে স্বকীয়; আবার সেই স্ত্রীই যখন পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের, তখন স্বামী ও নিজের কাছে সে-ই পরকীয়। যাহার যত বেশী ব্যাপক জীবন, সে তত বেশী নিজের নিকটও নিজে পরকীয়। বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে মানুষ যখন বিচরণ করে, তখন তাহার নিজের নিকট ও আত্মীয়ের নিকট সে হয় পরকীয়। যখন একজন জজের পিতাকে পুত্রকে কোর্টে হুজুরই বলিতে হয়, তখন তাহাদের পিতাপুত্রের সম্বন্ধের মধ্যে স্বকীয়ত্ব থাকে না। সেই সময়ের সেই পিতাপুত্রের সম্বন্ধই হয় পরকীয়। আমার নিজের উপরেই আমার দাবী নাই, কেননা "আমি" বলিতে শুধু আমাকেই বুঝায় না। আমি আমার মা বাবা, ভাই বোন, স্বামী স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব সকলের। এজন্যই মানুষের আত্মহত্যা করিবার কোন অধিকার নাই। আত্মা বলিতে কেবল আমিই বুঝায় না। আমি যে সকলের, সকলেই যে আমার; মানুষের জীবন একটি বিরাট তত্ত্ব। ইহাকে পরিপূর্ণরূপে না বুঝিয়া একটা মাত্র দিক লইয়া সমাজ গঠন করিতে গিয়া সমাজ-যন্ত্র বিকল হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক মানুষই যুগপৎ স্ব এবং পর।

আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভিতর যে তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা কি কোনদিন ভাবিয়া দেখিয়াছ? এ দেশের একটি মেয়ে পঞ্চপতি লইয়াও সতীরূপে জগতে পূজিতা। প্রত্যেক মানুষের বহু হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে, দ্রৌপদী তাই পঞ্চস্বামীকে পাঁচরূপেই সেবা করিতেন। দ্রৌপদী যখন যুধিষ্ঠিরের নিকট থাকিতেন, তখন তিনি তাঁহার স্বকীয় রূপেই থাকিতেন, তাঁহার হইয়াই থাকিতেন; ভীম প্রভৃতি অন্য ভাইদের নিকট দ্রৌপদী তখন পরকীয়। ভীমাদির মধ্যে যাহার নিকট যখন আবার দ্রৌপদী যাইতেন, তখন তিনি তাঁহার মত হইয়াই যাইতেন, যুধিষ্ঠিরাদি অপর চারিজনের নিকট তখন থাকিতেন পরকীয়রূপে। এই যে বহু হইবার যোগ্যতা তিনি পাইয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল তাঁহার শক্ত অহং গলাইয়া পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আমির মাঝে ডুবাইয়া দেওয়া। সেইজন্যই তিনি নমনধর্ম্মশীল হইতে পারিয়াছিলেন; যখন যাঁহার কাছে থাকিতেন, তখন তাঁহারই মতন হইতে পারিতেন। গোড়ায় তাঁহার যে অদ্বৈতবুদ্ধি ছিল, বিশ্বরূপ জীবন ছিল, সেই অদ্বৈতবুদ্ধি ও বিশ্বরূপ জীবন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভাইয়েরও ছিল, তাঁহারাও পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবনে স্ব স্ব জীবন অর্পণ করিয়া অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্যই দ্রৌপদী পঞ্চপতির সেবা করিয়াও সতী। যুধিষ্ঠিরাদি যদি শ্রীকৃষ্ণের ভিতর আত্ম-সমর্পণ করিয়া অদ্বৈত না হইতেন, এবং নিজেরাও নমনধর্ম্মশীল হইতে না পারিতেন তাহা হইলে দ্রৌপদী কিছুতেই পাঁচ পতির সেবা করিয়া সতী থাকিতে পারিতেন না।

সৎস্বরূপ ব্রহ্মের ভিতর যে নারী ডুবিলেন, যুক্ত হইলেন, তিনিই তো সতী। ছন্দই সতীত্ব। সতীত্ব তো বাহিরের কোন একান্ত একটি রূপই নয়। ভারতীয় সমাজে এবং সাহিত্যে দ্রৌপদীর আসন তো কোন নারীর চাইতে নীচে নয়। একও সত্য, বহুও সত্য, যদি একে বা বহুতে প্রকৃতির পরিপূর্ণ স্বাধীন বিকাশ জমাট বাঁধিয়া উঠে। কাহারও জীবনের

এই বিকাশের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করিলে চলিবে না। বৈষ্ণবসম্প্রদায় পরকীয় রসকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, পরকীয় ভাবই মুক্ত জীবনের ভাব। সমস্ত বিশ্বকে যে পরকীয়রূপে দেখিল, সমস্ত বিশ্বের নিকট সে পরকীয়রূপে, অধররূপে রহিল। বিশ্বকে যখন মানুষ ভালবাসে, তখন সে নিজের কাছেই নিজে পরকীয় হয়। এই মুক্ত পুরুষ ও মুক্ত নারীজীবনের সমকক্ষতার উপরই গড়িতে পারে নির্ম্মল মুক্ত সমাজ। জীবন্ত ও গতিশীল পরিবার গড়িতে হইলে এই পরকীয় সম্পর্কটাকে পরিবারে লইতেই হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকেই একথা মনে রাখিতে হইবে যে, অপর কোন মানুষ, বস্তু বা ঘটনা এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত তাহার একান্ত ভোগ্য নহে, উহাদের প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব স্বাধীন সত্তা আছে।

স্মৃতি—তুমি বলিয়াছিলে যে, প্রত্যেক মানুষের ভিতর পুরুষ ও প্রকৃতি ভাব দুই-ই রহিয়াছে, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতেছি না। আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বল না!

শ্রুতি—দার্শনিক ভাবে একথা বুঝাইয়াছি। মানুষের মধ্যে যে একত্বের দিক, তাহাই পুরুষভাব এবং তাহার যে বহুত্বের দিক, তাহাই প্রকৃতিভাব। একত্ব ও বহুত্বের এই দুই ভাবই প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারীর ভিতর রহিয়াছে। কোনও কোনও পুরুষ যে বাহিরে, বাহিরের মেয়েদের নিকট যায়, ইহার কারণ কি জান? ঘরে যে তাহাদের স্ত্রী আছে, তাহারা তো তাহাদের একান্ত ভোগ্য বস্তু। নিজেদের যত অযোগ্যতাই থাকুক, মেয়েদের নিকট হইতে সেবা আদায় করাই তাহাদের কাজ; কেননা তাহারা যে পুরুষ, তাহারা যে স্বামী। কিন্তু সেই স্বামী বেচারাদের ভিতরেও তো আবার প্রকৃতিভাব রহিয়াছে। সেইজন্য তাহাদের ভিতরেও সেবা করিবার ইচ্ছা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে; সেই সাধ পূর্ণ করিবার জন্যই তাহারা বাহিরের নারীকে চায়। ঘরের স্ত্রীকে যদি একান্ত ভোগ্যবস্তু বলিয়া, স্বকীয় বলিয়া ধরিয়া না লইত, প্রাণ-খোলা ভালবাসার

ভিতর দিয়া স্বাধীনভাবে সম-মর্য্যাদা দান করিয়া পরস্পরকে পরকীয় করিয়া রাখিতে পারিত এবং নারীরাও যদি বিশ্বরূপ হইত, ব্যক্তিগত জীবন এবং বিশ্বরূপ জীবনের সমন্বয় বুঝিত, তাহা হইলে ঘরেই উভয়ে উভয়ের সেবা করিয়া তাহাদের সেবা করিবার সাধ মিটাইতে পারিত। বাহিরে যাইবার আর প্রয়োজন হইত না। মেয়েরাও ঘরের ভিতর অবাধ স্বাধীনতা, মর্য্যাদা ও আদর পাইয়া তৃপ্ত হইত। ঘরের বাহিরে আসিয়া বাহিরের মেয়ে বলিয়া কলঙ্কের পশরা মাথায় করিয়া বহন করিতে হইত না। বাহির আর একান্ত বাহির থাকিত না, ঘরও একান্ত ঘর থাকিত না।

ঘরেই বাহির,বাহিরেই ঘর—এই ভাবে ঘর বাহিরের সমন্বয় করিতে না পারিলে জীবন্ত, তাজা, ছন্দের সংসার গড়িবে কিরূপে? ঘর এবং বাহিরের বিচ্ছিন্নতাই এমন করিয়া পরিবার জীবন, সমাজ জীবনকে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। রাধারাণী তাই তো বলিতেছেন—"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।" ঘর ও বাহিরের সমন্বয় শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার আদর্শের মূল কথা। স্বামী স্ত্রীর একান্ত আপনও নয়, একান্ত পরও নয় এবং স্ত্রী স্বামীর একান্ত আপনও নয় একান্ত পরও নয়। এইভাবে বিশ্বরূপ জীবন যাপন করিয়া পরস্পরে যে সম্বন্ধ ইহাই পরকীয় সম্বন্ধ; স্বামীস্ত্রীর ভিতর এই পরকীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই ভবিষ্যৎ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িতে হইবে।

ঘরে মেয়েদের বাহিরের সাধ পূর্ণ হইতেছে না বলিয়া তাহারা বাহিরে ছুটিয়াছে। মূর্ত্তিমতী কলা হইতেছে নারী; সে আজ সকল কলা হইতে বঞ্চিত হইয়া নীরস হইয়া পড়িয়াছে, পুরুষের মন তাহাতে তৃপ্ত হইতেছে না। একদল মেয়ে তাই ঘর ভাঙ্গিয়া বাহিরে যাইয়া গানবাদ্যের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুরুষেরা ঘর ছাড়িয়া সেখানে যাইয়া ভিড় জমাইতেছে। এমনই করিয়া সমাজের প্রতি স্তরে

যে কি বিচ্ছৃঙ্খলা ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজকাল মেয়েদের কিছু কিছু গানবাদ্য ও নাচ শিখান হইতেছে বটে, কিন্তু পরিবারের অঙ্গাঙ্গিরূপে উহাকে গ্রহণ না করায় বিবাহের পর আর মেয়েদের সে গানবাদ্যের চর্চ্চা থাকে না। কাজেই সে শিক্ষা জীবনে কার্য্যকরীও হইতেছে না। সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইলে অতীতের সমস্ত চিন্তাধারাকে নূতন ছাঁচে ঢালিতে হইবে। পুরুষোত্তমদর্শনের উজ্জ্বল ভিত্তির উপর গড়িতে হইবে নূতন জীবন্ত মুক্ত সমাজ।

স্মৃতি—তুমি নূতন জীবন্ত মুক্ত সমাজ গঠনের কথা বলিলে, আবার গান বাজনাকে পরিবারের অঙ্গাঙ্গিরূপে লইবার কথা বলিলে; মেয়েরা ঘরে যদি গান বাজনা লইয়াই থাকে, মা হইয়া সংসার করিবে কিরূপে? আর গান বাজনা লইয়া থাকিলেই কি জীবন্ত সমাজ গঠিত হইবে?

শ্রুতি—বুঝিতে পারিতেছ না স্মৃতি, আমি একটি সমগ্র জীবনের কথাই বলিতেছি। আমাদের দেশ নারীর জননী রূপেরই গৌরব দিয়াছে, নারীর রমণীরূপকে এ-দেশ গৌণ করিয়া দেখিয়াছে। সেইজন্য রমণী-জীবনের নাচ গান প্রভৃতি সকল কলাই বাদ পড়িয়াছে। ইহাতে জননীরূপের সবটুকু সম্মান ও স্থানই কি সে পাইয়াছে? নারীর জীবনবিকাশের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া, জগতের সকল ব্যাপার ও সকল ক্ষেত্র হইতে তাহাকে সরাইয়া আনিয়া একমাত্র ঘরের কোণে রান্নার হাতা-বেড়ীর মালিক করিয়া সমাজ ও শাস্ত্র তাহাকে সতী ও মাতা সাজাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহা কি সম্ভব হইয়াছে? নারীজীবনের যে ব্যাপকত্ব, বন্ধুত্ব রহিয়াছে তাহা পড়িয়াছিল বাদ। কিন্তু ইহা সে কতদিন কেমন করিয়া সহ্য করিবে? নারী মূর্ত্তিমতী কলা, তাহার জীবনের সকল কলাক্ষেত্র মুছিয়া ফেলিয়া সতী তৈয়ার করিতে যাইয়া সমাজ তাহার জীবন্ত সমাধিরই ব্যবস্থা করিয়াছে। নারীজীবনের নাচ, গান, বাদ্য, চিত্র, শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, শাস্ত্র ও বিজ্ঞান কিছুরই স্থান কি

বর্ত্তমান পরিবারজীবনে নারীর জন্য রহিয়াছে? নারীকে জীবন্তরূপে—রমণীত্ব ও জননীত্বের সমন্বয়রূপে—পাইতে হইলে তাহার সমস্ত অধিকারই তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। জীবন্ত পরিবার গঠন করিতে হইলে প্রতি পরিবারকে বিশ্বজীবন যাপনের ক্ষেত্ররূপেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং বিশ্বের সকল ক্ষেত্রের সহিত তাহার যোগও রক্ষা করিতে হইবে।

প্রত্যেক মানুষই বিশ্ববাসী; বিশ্বের সকল ক্ষেত্র বাদ দিয়া সে পূর্ণ মানুষ হইবে কি করিয়া? কোন-কিছু বাদ দিয়া পূর্ণ জীবনগঠন হয় না। অতীতের সমস্ত আদর্শ নারী-চরিত্রে কি ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় না যে, তাঁহারা সকল বিদ্যাসম্পন্না হইয়াই মা হইয়াছেন, এবং পরিবারজীবন যাপন করিয়াছেন। সুভদ্রার মত মেয়ের আদর্শ আমাদের দেশেই রহিয়াছে; তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। যেদিন তিনি অর্জ্জুনের রথে সারথির কার্য্য করিয়াছিলেন, সেদিন রথ চালনার কি অপূর্ব্ব কৌশলই না দেখাইয়াছিলেন! তিনি বীররমণী, আবার তিনিই বীরমাতা। নিজ হাতে শিশু সন্তানকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মাঝে মৃত্যুর মুখে সাজাইয়া পাঠাইয়া দিতে তিনিই পারিয়াছিলেন। আমাদের দেশে আদর্শ বীররমণী, বীরমাতার উজ্জ্বল চিত্রের অভাব নাই। বর্ত্তমানেও যে সমস্ত মহীয়সী নারী দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর অনেকেই মা ও স্ত্রী এবং তাঁহাদের সংসারও আছে। তাঁহাদের সংসার ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ সংসার নয়, তাঁহাদের জীবনে বিশ্বরূপ রহিয়াছে। মা হইতে হইলে কি জীবনের সকল দিক বাদ দিয়া মা হইতে হয়, না হওয়াই যায়? বর্ত্তমান মেয়েরা জগতের সহিত সম্পর্কহীন হইয়া, জগন্মাতা না হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে, সেইজন্যই প্রকৃত মা কেহ হইতে পারিতেছে না। যিনি জগতের মা নন, তিনি নিজ পুত্রের মা হইবারও যোগ্য নন। বিশ্বমাতৃ-শক্তিরই কোলে সন্তান বীর হয়।

গানবাজনা কলার একটি প্রধান অঙ্গ; জীবনকে সরস করিয়া

রাখিয়া সমগ্রভাবে আস্বাদন করিতে হইলে উহার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। পূর্ব্বে মেয়েদের গান-বাদ্য-নৃত্যাদি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও ছিল। বিরাটরাজদুহিতা উত্তরাকে বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন নৃত্যগীত শিখাইয়াছিলেন। বেহুলার নৃত্য দেখিয়া স্বর্গের দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মৃত স্বামীকে বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন। মীরাবাঈয়ের গানে বাদশাহ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। নারীজীবনে গান একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একটি পরিপূর্ণ জীবন গঠন করিতে হইলে নাচ, গান, বাদ্য, শিল্প, চিত্র, সাহিত্য, কাব্য, শাস্ত্র, বিজ্ঞান এই সমস্ত দিকের চর্চ্চাই রাখিতে হইবে। মেয়েদিগকে এই সকল যোগ্যতা লইয়া অথচ ছন্দ বজায় রাখিয়া মা হইয়া সংসার করিতে হইবে। মানুষ যখনই সকল স্তরের সকল যোগ্যতা লইয়া দাঁড়ায়, তখনই তাহার যোগেশ্বর ভগবানের সহিত যোগ হয়। সৎ ভগবানের সহিত যাহার যোগ হয়, তিনিই সতীশিরোমণি। সতের সহিত সকল প্রকারের যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়া, জীবনের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের কোণে সতী বানাইবার জন্য হুড়াহুড়ি ও সতী সাজিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টায় সমস্তই ব্যর্থ হইতেছে।

ভারতবর্ষে আদর্শ সতী, আদর্শ নারী যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই কলাবিদ্যাসম্পন্না বিদুষী রমণী ছিলেন। দ্রৌপদী সর্ব্ব বিষয়ে যোগ্য ছিলেন, বিশ্বেশ্বরের সহিত যুক্ত ছিলেন, বিশ্বসেবা করিয়াছিলেন, তাই তো তিনি সতী। তিনি ছিলেন স্ব স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত। ইহাই সার্থক সংসারজীবন যাপন করার কৌশল; স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বরূপ জীবনযাপনই সংসার করার কৌশল। যেখানে সংসার ও বিশ্ব এক হইয়া থাকে, সেই স্তরে দাঁড়াইয়া সংসার করিতে হয়। এইরূপ সংসারের অর্থাৎ বিশ্বরূপ সংসারের সেবা যে করে, সেও সার্থক হয়; যাহারা সেবা লয়, তাহারাও সার্থক হয়। এই সেবার ভিতর দিয়া নারী সতী, পুরুষ বিশ্ববিজয়ী সৎ হয়। সমগ্র জীবনের শিক্ষাই আজ নারী জাতিকে শিখাইতে

হইবে, যেমন-তেমন করিয়া ঘর করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। ডাক আসিয়াছে পূর্ণ মানুষ হইবার। নারী একাধারে রমণী ও জননী।

স্মৃতি—তোমার কথা শুনিয়া আমি যেন এক নূতন জীবনের স্পর্শ পাইলাম। কিন্তু কেমন করিয়া মেয়েদের ভিতর এই স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যের ভাব-ধারাকে জাগাইয়া তোলা যায়? কেমন করিয়াই বা পুরুষোত্তমদর্শনের ছাঁচে জীবন্ত সমাজ ও পরিবার গড়িয়া তোলা যায়, সেই সম্বন্ধে কিছু বল না ভাই?

শ্রুতি—এই চিন্তাধারা সমাজে দিতে হইলে, পরিবারজীবন গঠন করিতে হইলে প্রথমে মেয়েদিগকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে হইবে যে, অতীতে তাহারা কিরূপ অপমানিত জীবন যাপন করিয়াছে যাহার ফলে আজ তাহাদের ঘরছাড়া হইতে হইয়াছে, কি জন্য কি চাহিয়াই বা তাহারা ঐ অতীত ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে; বর্ত্তমান বিদ্রোহের ভিতর তাহারা আবার কোথায় ভুল করিতেছে, এবং নারীপ্রগতির ভবিষ্যৎ রূপই বা কিরূপ হইবে, তাহাও স্পষ্ট করিয়া ধরাইয়া দিতে হইবে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে চাই কতগুলি মেয়ে যাহারা হইবেন পুরুষোত্তমার্পিতমনোবুদ্ধি, সর্ব্বত্যাগিনী যৌগিনী, যাহাদের ত্যাগের ভিতর দিয়াই গড়িবে পরিবারের বাহিরে নারীসংঘ। মেয়েদের ভিতর আর একদল মেয়ে থাকিবেন ঘরে, যাহারা পুরুষোত্তমের বিপ্লবের বাঁশী শুনিয়াছেন ও উহার অর্থও বুঝিয়াছেন; কিন্তু সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া বাহিরে আসিবার সুযোগ পাইতেছেন না। এই দুই দল মেয়েকেই পুরুষোত্তমদর্শনের ভিতর অবগাহন করিতে হইবে এবং এই দুই দল পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া চলিবে। যখন ঘর ও বাহির একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন এইভাবে ঘর ও বাহিরের সমন্বয়ের উপরই গড়িতে হইবে ঘর, ঘরের শৃঙ্খলা।

ব্রজে ব্রাহ্মণপত্নীগণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অন্ন ভিক্ষায় চঞ্চল হইয়া স্বামীগণের নিষেধ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের মুখে অন্ন দিবার জন্য ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। অন্ন খাওয়ানো হইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদিগকে

ঘরে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, তখন তাঁহারা ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আমরা স্বামীদের নিষেধ সত্ত্বেও তোমার মুখে অন্ন দিবার বাসনায় ঘর ছাড়িয়া বনে আসিয়াছি। তাঁহারা আমাদিগকে আর ঘরে স্থান দিবেন না। আমরা ঘরে ফিরিয়া যাইব না।" তখন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মণপত্নীগণ, তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও, তোমাদের কোন ভয় নাই। ভগবানে অর্পিত প্রাণ যাহাদের, তাহাদের সেই ভগবৎসেবা-প্রবণ প্রাণকে কি সংসারধর্ম্মপালনে কেহ বাধা দিতে পারে? আমি বলিতেছি, তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও; তোমাদের স্বামীগণ তোমাদিগকে অধিকতর আদরের সহিত গুরুরূপে বরণ করিয়া লইবেন।" সত্যই ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণপত্নীগণকে আদরের সহিত গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন ঃ—

অহো বয়ম্ ধন্যতমা যেষাং নস্তাদৃশীঃ স্ত্রিয়ঃ।
ভক্ত্যা যাসাং মতির্জাতা অস্মাকং নিশ্চলা হরৌ॥

"অহো, আমরা ধন্যতম যাহাদের এমন লক্ষ্মী স্ত্রী লাভ ঘটিয়াছে। ইহাদের ভক্তিতে আমাদেরও হরিতে নিশ্চলা মতি জন্মিল।" পুরুষোত্তমের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সেই আত্মসমর্পিত জীবন লইয়া যে সংসার গড়িয়া উঠে, সেই সংসারই সার্থক সংসার; সেই সংসারেই পুরুষ স্ত্রীকে, স্ত্রী পুরুষকে গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়া সার্থক হয়। এই সার্থক সংসারের চিত্রই সর্ব্বত্যাগী ভোলানাথের কোলে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী দুর্গাশক্তি।

ভগবান অবতরণ করেন সংসারকে ভাঙ্গিয়া সকলকে ঘরছাড়া সন্ন্যাসী সাজাইবার জন্য নয়। মানুষকে প্রকৃত মানুষ, প্রকৃত সংসারী সাজাইবার জন্যই তিনি আসেন। এতদিন ঘর এবং বাহিরকে, সন্ন্যাস এবং সংসারকে পৃথক করিয়া রাখিয়া মানুষ সংসার করিতে গিয়াছিল, সেইজন্য সংসার এবং সন্ন্যাস দুই-ই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। ভগবান তাঁহার সাধের সৃষ্টির এই বিপর্য্যয়গতি দর্শনে বেদনাতুর হইয়া, সংসার এবং সন্ন্যাসের সমন্বয়ের

ভিত্তিতে বিশ্বকে গড়িয়া তুলিবার জন্যই বিশ্বে অবতরণ করিয়াছিলেন। ধ্বংসোন্মুখ পরিবারজীবনের পুনর্গঠনের কৌশলই তাঁহার অবতরণ লীলার ভিতর নিহিত রহিয়াছে। ব্রজলীলার পরই তাঁহার দ্বারকালীলা। ব্রজ-লীলায় আছে কেমন করিয়া সকল অত্যাচারের, সকল ক্লীবত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা করিয়া, শ্রেণীসংঘর্ষের পথে না যাইয়া কেবলমাত্র হৃদয়ের বেদনা ও চোখের জলকে সম্বল লইয়া, সব প্রতিকূল আবেষ্টনকে চরিত্রমাধুর্য্যে হজম করিবার দুর্জ্জয় শক্তিসহায়ে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে বাহিরে সরিয়া দাঁড়াইয়া পুরুষোত্তমের মাঝে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, পুরুষোত্তম জীবন লাভ করিতে হয় ও জীবনে সার্থক হইতে হয়, তাহারই চিত্র। দ্বারকালীলায় দেখাইয়াছেন কেমন করিয়া পুরুষোত্তমে অর্পিত হইয়া, পুরুষোত্তমকে লইয়া সংসার করিতে হয়, সংসার-যাত্রাকে সার্থক করিতে হয়, তাহারই চিত্র।

স্মৃতি—তুমি সংসারকে গড়িতে হইলে দুই দল মেয়ের কথা কেন বলিতেছ? একদল মেয়ের বাহিরে থাকিবার কি নিতান্তই প্রয়োজন রহিয়াছে?

শ্রুতি—দুই দল মেয়ের কথা কেন বলিলাম তাহা শোন। একদল সর্ব্বত্যাগিণী ঘরছাড়া মেয়ে বাহির হইতে মুক্তির বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া আসিবে, তাহাকে আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দিবে; অপর একদল মেয়ে ঘরের ভিতর থাকিয়া সেই মুক্তির বার্ত্তাকে নিজেদের বুকে বরণ করিয়া লইবে, গৃহসংস্কারের কাজে লাগিয়া যাইবে। ঘরের ভিতর একদল মেয়ে পুরুষোত্তমদর্শনের ছাঁচে ঘরকে গড়িয়া তুলিতে প্রাণপণ করিবে, অপর একদল মেয়ে বাহির হইতে দিকে দিকে এই পুরুষোত্তমদর্শন প্রচার করিবে। এই প্রকারে যদি একদল ঘরের ভিতর হইতে ধাক্কা দেয়, এবং আর একদল বাহির হইতে ধাক্কা দেয়, তাহা হইলেই জীর্ণ সমাজের ভিত্তি চূর্ণ হইয়া পড়িবে। এই দুই দল মেয়ের প্রাণবন্ত ধাক্কার ভিতর দিয়াই উচ্ছৃঙ্খল সমাজ গড়িয়া উঠিবে পুরুষোত্তম-

দর্শনের ছাঁচে উজ্জ্বল সমাজরূপে। তুমি তো জান পুরাকালে গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্না একদল মেয়ে ঘরের বাহিরেই ছিলেন। সংসারকে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে আলোকিত রাখিবার জন্য, সংসারের ছন্দ ঠিক রাখিবার জন্য আচার্য্যরূপে একদল মেয়ে এবং একদল ছেলে ঘরের বাহিরে থাকিবেই; তবে সংখ্যায় তাহারা থাকিবে কম। বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যেরূপ লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী ভিক্ষার পাত্র বাড়াইয়াই তুলিয়াছে, সেরূপ নয়। প্রকৃত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর শক্তি অসীম। তাহাদের ব্রহ্মশক্তিতেই ভোগবহুল সংসারক্ষেত্র সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হয়।

পূর্ব্বে প্রত্যেক রাজা মুনিঋষিদের নির্দ্দেশ লইয়াই রাজ্যকে পরিচালনা করিতেন। আবার দেখ—কংগ্রেসের একদল লোক কাউন্সিলে ঢুকিয়াছিলেন, অপর একদল রহিলেন বাহিরে। যাহারা কাউন্সিলে ঢুকিয়াছিলেন, তাঁহারা সেখান হইতে জনসাধারণের জীবনপথে চলিবার উপযোগী যত কিছু সুযোগ সুবিধা করিয়া দিবার জন্য, আইন পাশ করাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপর একদল যাহারা বাহিরে রহিলেন, তাঁহারা বাহিরে জনসাধারণের ভিতর তাহাদের অবস্থা এবং তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বোধ জাগাইয়া রাখেন। জনসাধারণ তাহাদের অধিকার, তাহাদের দাবী যাহাতে কাউন্সিল হইতে পাশ করাইয়া আনিতে পারে, ইঁহারা সেইরূপ প্রেরণাই দিতেছেন। একদল বাহির হইতে পরিধিতে দাঁড়াইয়া দিতেছেন ধাক্কা, অপর দল ভিতর হইতে কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া করিতেছেন গঠন। এই জন্যই দুইদল মেয়ের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যে একদল মেয়ে ঘরের বাহিরে রহিল, তাহাদের বাহিরে থাকাটা ঘরকে গড়িয়া তুলিবার জন্যই শুধু; বাহিরে যাইবার জন্যই তাহাদের বাহিরে যাওয়া নয়। ঘরের মেয়েরা যখন বিশ্বরূপ জীবন যাপন করিবে, বিশ্বের ভাবনা ভাবিবে, তখনই হইবে ঘর এবং বাহিরের সমন্বয়। বাহিরের মেয়েরাও যখন ঘরের ভাবনা ভাবিবে অর্থাৎ সমাজের কল্যাণ, পরিবারের কল্যাণ এবং

বিশ্বের কল্যাণের কথা ভাবিবে, তখনই হইবে সংসার এবং সন্ন্যাসের সমন্বয়।

স্মৃতি—সংসার এবং সন্ন্যাসের সমন্বয়ের রূপ কি? এই সংসার এবং সন্ন্যাসের সমন্বয়-আদর্শ বর্ত্তমান বিশ্বে কাহার দান?

শ্রুতি—এপর্য্যন্ত যাহা কিছু বলিয়াছি সমস্তই সন্ন্যাস ও সংসারের সমন্বয়ের কথা। জ্ঞান হইতেছে সন্ন্যাসের রূপ, কর্ম্ম হইতেছে সংসারের রূপ; জ্ঞানের স্বরূপ মুক্তি, সংসারের স্বরূপ বন্ধন; জ্ঞান পুরুষ, কর্ম্ম প্রকৃতি। জ্ঞান আসিয়া যখন কর্ম্মকে আলিঙ্গন করে, তখনই বদ্ধ কর্ম্মময় সংসার মুক্ত জ্ঞানী পুরুষের আলিঙ্গনে মুক্ত হয়। জ্ঞান এবং কর্ম্মের যুগল মিলনেই মুক্ত বিশ্ব, অবধূত বিশ্ব গড়িয়া উঠে; তখনই হয় সংসার এবং সন্ন্যাসের সমন্বয়। এতক্ষণ ধরিয়া তোমার সহিত যে আলোচনা করিয়াছি, তাহার ভিতর এই কথাটাই বলিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছি। এই সংসার ও সন্ন্যাসের সমন্বয় বর্ত্তমান বিশ্বে যুগ-দেবতা পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের দান।

এ পর্য্যন্ত কোন মঠে কোন সন্ন্যাসী মেয়েদের স্থান দিতে সাহস পান নাই। পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার মঠে মেয়েদের স্থান দিয়াছেন। তিনি আকার এবং নিরাকারের, সংঘ ও আদর্শের সমন্বয়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন, জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। যাহা-কিছু আবেষ্টন তাহাই আকার, তাহাই প্রকৃতি। যাহা-কিছু আদর্শ, নিরাকার, তাহাই পুরুষ। এই আকার ও নিরাকারের সমন্বয়মূর্ত্তি পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল। তিনি নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থ পুরুষ, তথাপি চারিদিকের ঘটনারূপিণী প্রকৃতিবেষ্টিত। তিনিই করিয়াছেন বিশ্বের সামনে প্রকৃতির গৌরবময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা। তিনিই দেখাইয়া গিয়াছেন যে, প্রকৃতি সন্ন্যাসের ও ব্রহ্মজ্ঞানের একান্তভাবে বাধাই নয়, সে সন্ন্যাসের রক্ষকও বনিতে পারে। তাঁহার কাছে প্রকৃতির স্থান কত বড়, কত উচ্চে! ব্রজলীলাতে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণও ইহাই

দেখাইয়াছেন। পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল ছিলেন অবধূত। কামিনী-কাঞ্চনের পারমার্থিক বিশ্বরূপ ফুটাইয়া সকল ঝঞ্ঝাট হজম করিয়া যে সমাধি, উহাই অবধূতের সমাধি। অবধূতশিরোমণি শ্রীনিত্যগোপাল সংসার একান্তভাবে ত্যাগ করিয়া যে সন্ন্যাস, তাহা শিখাইতে আসেন নাই। তিনি সংসারের সকল বিষ হজম করিয়া যে অবধূত জীবন, তাহাই বিশ্বের সামনে রাখিয়া গিয়াছেন। উদ্‌ভ্রান্ত বিশ্ব এই অবধূত-জীবনে অবগাহন করিয়াই স্বস্বরূপে স্থিত হইবার জন্য পাগলের মত ছুটিয়াছে।

স্মৃতি—আজ ভাই, তোমাকে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম। ধর্ম্ম এবং সংসারের নূতন রূপ দেখিয়া আমার যে কি আনন্দ হইতেছে, তাহা বুঝাইবার ভাষা আমার নাই। মনে হইতেছে অতীতের সকল সংস্কার ঝাড়িয়া ফেলিয়া জীবনকে এই পুরুষোত্তমদর্শনের মাঝে গড়িয়া তুলি। এতদিনের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা আজ যেন সার্থকতায় গড়িয়া উঠিবার জন্য ব্যাকুল। আমার আরও কয়েকটী প্রশ্ন রহিয়াছে, বলিতেছি শোন। অতীতে যে ছোট মেয়েদের বিবাহের প্রথা ছিল, তাহাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ছিল, না বর্ত্তমানে যে মেয়েদের বড় করিয়া বিবাহ দেওয়া হইতেছে তাহাতেই সমাজের কল্যাণ হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কি মত?

শ্রুতি—ছোট মেয়ের বিবাহ দিবার ভিতর রহিয়াছে মেয়েদের নিজস্ব কোন স্বাতন্ত্র্য, কোন ব্যক্তিগত সত্তাকে স্বীকার না-করার ব্যবস্থা। মেয়েদের যে বয়সে বিবাহ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই জন্মে না তখন শুধু অভিভাবকদের ইচ্ছামত তাহাদের বিবাহ দিয়া দিলে একটা কাঠামোর মধ্যে পড়িয়া যাইয়া তাহার চাপে আর কোন দিন তাহাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিতে পারে না। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের সম্ভাবনাকে চিরতরে লোপ করিয়া দেওয়াই ছিল বারো বছরের আগেই মেয়েদের বিবাহ দিবার ব্যবস্থার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। অল্প বয়সে স্বামীর পরিবারের ভিতর

যাইয়া নিজস্ব সত্তা তাহাদের ভিতর ডুবাইয়া দিয়া তাহারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকিত। ইহার ফলে কিছু দিন সমাজ শৃঙ্খলা অব্যাহত রহিল বটে, কিন্তু সংসারে মান না পাইয়া, তাহার বিশ্বরূপ জীবনের খোরাক না পাইয়া নারীজীবন গেল শুকাইয়া এবং সঙ্কীর্ণ হইয়া। পূর্ব্বে যে ৫।৭ বৎসরের মেয়েদের বিবাহ হইত, তাহারই প্রতিক্রিয়ার ফলই হইতেছে আজ মেয়েদের বিবাহ না-করা বা বড় হইয়া বিবাহ করা প্রভৃতি।

কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষা না পাইয়া অথচ বড় হইয়া মেয়েদের বিবাহ হওয়ার ফলে সমাজে যে বিশৃঙ্খলা চলিতেছে, তাহাও তো লক্ষ্য করিবার বিষয়। মেয়েদের বিকৃত স্বাতন্ত্র্য-বোধ জাগ্রত হওয়ায়, পরিবার আর একান্নবর্ত্তী পরিবাররূপে গণ্য হইতে পারিতেছে না। একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া যাওয়ার অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য আর যে কারণই থাকুক না কেন, মেয়েদের এই বিকৃত স্বাতন্ত্র্যবোধ যে একটি প্রধান, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অপরকে সহ্য করার মনোবৃত্তি তাহাদের বিশেষভাবে লোপ পাইয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকৃত বোধ তাহাদিগকে কেবল নিজেকেই প্রাধান্য দিতে শিখাইয়াছে। নিজ বলিতে তাহারা যাহা বুঝিতেছে, তাহা সমগ্রতার স্পর্শহীন একেবারেই একটি বিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তির ফল। সেই স্ব স্ব প্রাধান্যে পরিবারজীবন অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

কল্যাণ কোন পথেই নাই, যদি সমাজের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন না হয়। প্রাচীনকালে কি মেয়েরা বড় হইয়াই পতি বরণ করিতেন না? শিশু বয়স হইতেই তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের আদর্শ তাহাদের সমগ্র জীবনকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিত। সাবিত্রী, সুভদ্রা, দময়ন্তী প্রভৃতি বড় হইয়া, বহু শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া নিজেদের স্বামী নিজেরাই নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ ও

সমগ্র ক্ষেত্রের সেবা আজও জগতের বুকে অম্লান। এই প্রকার আমাদের দেশে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগের বহু নারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। দোষ বড় করিয়া বিবাহ দিবার ভিতরেও নয়, ছোট থাকিতে বিবাহ দিবার ভিতরেও নয়; দোষ রহিয়াছে সমাজগঠনের কৌশলের ভিতরে, দোষ রহিয়াছে সমাজের শিক্ষার ভিতর। গতিধর্ম্মী পুরুষোত্তমদর্শনের সমগ্রতার ছাঁচে যদি সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবার গঠিত হইত, তাহা হইলে বড় হইয়াই বিবাহ হউক বা ছোট থাকিতেই বিবাহ হউক, তাহাতে কিছুই দোষ হইত না, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও বজায় থাকিত অথচ সমগ্রের উপরও কোন আঘাত পৌছিত না। যে যে স্তরে, যে অবস্থায়ই থাকিত, সে সেখান হইতেই তাহার স্বরূপ-বিশ্বরূপ জীবনের দুই দিকের আস্বাদন করিয়া সার্থক হইত; কোনও অভিযোগ তাহাদের জীবনে থাকিত না। তবে আট, নয়, বারো বৎসরে বিবাহ সমর্থন করা যায় না। মেয়েদের জীবনের সমগ্র দিক দিয়া বিচার করিলে ষোল হইতে আঠারো বৎসরের মধ্যে বিবাহ দেওয়াই কল্যাণকর হইবে বলিয়া মনে হয়।

স্মৃতি—তুমি বলিয়াছ মনু মেয়েদের কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—“ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি”। কিন্তু তিনি তো কন্যাকে অতি যত্নসহকারে রক্ষণ ও পালনের কথাও বলিয়াছেন। এবং নারীজাতি যে পূজার যোগ্য তাহাও তো বলিয়াছেন, তবে আর মনু মেয়েদের উপর কি অবিচার করিয়াছেন? আমার মনে হইতেছে, তুমিই মনুযাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহাপুরুষদের উপর অবিচার করিতেছ।

শ্রুতি—মনুযাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আমার নমস্য; তাঁহাদের জীবনসম্বন্ধে বিচার করিবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। কিন্তু তাঁহাদের লিখিত শাস্ত্রের যে অংশকে কেন্দ্র করিয়া এই অচলায়তন সমাজ গড়িয়াছিল এবং

ক্রমপরিণতিতে যাহা আজ আমাদের চোখের সামনে বাস্তবরূপে দেখা দিয়াছে, আমি তাহার কথাই বলিতেছি। তাঁহারা যে সময় শাস্ত্র লিখিয়াছিলেন, তখনকার দেশকালপাত্রের উপযোগী করিয়াই লিখিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে আজ অতীতের সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করারও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যে শাস্ত্রদ্বারা এক যুগে কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রই অন্য যুগে বিকৃতরূপ ধরিয়া অকল্যাণের সৃষ্টি করে। এই জন্য অতীতের শাস্ত্র হইতে যে দোষের সৃষ্টি হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার আলোচনা করিয়া, শোধরাইয়া লইয়া বর্ত্তমান দেশকালপাত্রানুযায়ী শাস্ত্র দিতে হইবে।

স্বীকার করি, মনু নারীজাতিকে "পূজার্হাঃ গৃহদীপ্তয়ঃ" বলিয়া অর্চ্চিত হইবার যোগ্য বলিয়াছেন, কন্যাকে অতি যত্নসহকারে রক্ষণ ও পালনের কথাও বলিয়াছেন। আবার তিনিই "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" ও তো বলিয়াছেন। যেখানে নারীর স্বাতন্ত্র্যই স্বীকার করা হয় নাই, সেখানে নারী পূজিতা হইবার যোগ্য, কন্যা অতি যত্নসহকারে পালনীয় —এ সকলের অর্থ কি ইহাই হয় না যে, যদিও নারীর কোন স্বতন্ত্র মূল্য, স্বতন্ত্র মর্য্যাদা নাই, তথাপি সহায়ক-হিসাবে সংসারগঠনে যখন তাহার বিরাট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, "অতএব" তাহাকে আদরযত্নও করিতে হইবে, সেইভাবে লালনপালনও করিতে হইবে। গোড়ায় যাহার স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকৃতই রহিয়া গেল, সংসারগঠনরূপ প্রয়োজনের তাগিদেই যখন তাহাকে ঘরে আনা হইল, তখন কি ইহার মধ্যে একটা অভিসন্ধিই ফুটিয়া উঠিতেছেনা? এই আদর কি সত্যই আদর? এই শিক্ষা কি সত্যই শিক্ষা?

বর্ত্তমানে নারীজাতি পুরুষের নিকট হইতে এই অভিসন্ধিমূলক আদর যত্নই পাইতেছে। ব্রিটিশও ভারতবর্ষকে প্রচুর সুযোগসুবিধাই দিয়াছে; সে যে আমাদের কোনও অকল্যাণ করিতে পারে, এক সময় ইহা জন-

সাধারণ ভাবিতেও পারে নাই। আমাদের জন্য ইংরাজরাজ কতই না করিয়াছে! আমাদের শিক্ষার জন্য কত স্কুল কলেজ খুলিয়াছে; আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছে; আমাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রেলষ্টীমার প্রভৃতি যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে; সংবাদ আদানপ্রদানের বৈজ্ঞানিক সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে; দুষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কত আইনকানুন, কোর্ট কাছারী তৈরী করিয়াছে; মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, গ্রামোফোন কতই না ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের জন্য করিয়াছে। কিন্তু এত দিয়াও সে যে কিছুই দেয় নাই, এত করিয়াও যে কিছুই করা হয় নাই তাহা আমাদের চোখে আজ স্পষ্ট। ইংরেজ সবই দিয়াছিল স্বীকার করে নাই শুধু আমাদের স্বরাজ। স্বরাজহীন ভারতবর্ষের মর্য্যাদা নাই, স্বতন্ত্রতা নাই; সর্ব্ববিষয়ে সে অপরের হাতের পুতুলমাত্র। ইহারই পরিণতিতে আজ আসিয়াছে কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী, রাষ্ট্র-বিপ্লব। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিও নারীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করিয়া, তাহার স্বতন্ত্রতার মর্য্যাদা না দিয়া অনেক কিছু সুযোগসুবিধা, আদরসম্মান দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বিপ্লব আটকানো যায় নাই, আজ আসিয়া পড়িয়াছে বর্ত্তমান নারীপ্রগতি। বাস্তব ক্ষেত্রে কালের বুকে যে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহা বলিলে যদি অবিচার হয় বলিতে চাও, তাহা হইলে আমি আর কি করিব বল?

স্মৃতি—বিধবাবিধবা সম্বন্ধে তোমার মত জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। বিধবাদের ব্রহ্মচর্য্যজীবন যাপন করাই সঙ্গত না পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসার করাই উচিত?

শ্রুতি—এখানেও প্রশ্ন সেই সমাজশিক্ষারই, বিবাহ করা বা না-করার নয়। মেয়েরা যখন বিধবা হয়, তখন তাহাদিগকে যদি কোন বড় ব্যাপক আদর্শ না দিয়া, ঘটনাবহুল ভোগবহুল সংসারের

বিবাহাদি নানা প্রকার ভোগবিলাসের মধ্যে প্রতিনিয়ত রাখিয়াই দেওয়া হয়, তখন তাহাদের পুনরায় বিবাহিত জীবনযাপন করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়াটাই স্বাভাবিক। এরূপ স্থলে বাহির হইতে চাপানো ব্রহ্মচর্য্য কি কার্য্যকরী হইতে পারে? আবার বিচারের অবসর না রাখিয়া সবাইকেই যদি বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হয়, তাহাও তো ঠিক হইবে না। ব্রহ্মচর্য্য-জীবন যাপন করিবার অনুকূল মনোবৃত্তি লইয়াও তো অনেকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এইজন্যই বলিলাম বিবাহ করা বা না-করার মূলে রহিয়াছে শিক্ষা। সমাজের প্রয়োজন হইতেছে সর্ব্বাগ্রে জীবন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের সামনে বিশ্ব সেবার চিত্র আঁকিয়া ধরা এবং সেই বিশ্বসেবার দ্বার খুলিয়া দেওয়া। তাহা না করিয়া বাল্যকালে যখন মেয়েদের স্বাতন্ত্র্যবোধই জাগ্রত হয় নাই, সেই সময় তাহাদিগকে বিবাহ দেওয়া এবং ২।৩ মাস বা ২।৪ বৎসর পর যদি তাহারা বিধবা হয় তখন সেই কচি প্রাণ-গুলিকে আর বিকশিত হইতে না দিয়া তাহাদের জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষাকে দাবাইয়া কঠোর শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্যের বোঝা চাপাইয়া দেওয়াকে মানবতার দিক দিয়াই সমর্থন করা যায় না। এমন করিয়া তাহাদের মানুষজন্মকে ব্যর্থ করিয়া দিবার কি অধিকার আছে সমাজের?

সমাজ তাহার আইনের চাপে বিধবাদিগকে ব্রহ্মচারিণী সাজাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহা পারে নাই। সে সাজাইয়াছে একদল স্বেচ্ছাচারিণী নারী, আর একদল জীবনের সকল প্রেরণাহীন, অসার, ব্যর্থ, কতকগুলি প্রাণ যাহারা সমাজের গলগ্রহমাত্র। এইজন্য দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই বিধবাবিবাহের সুযোগ লইয়া পুত্রকন্যার মাতারা যখন-তখন পুত্রকন্যাকে ভাসাইয়া দিয়া বিবাহ করিতে ছুটিবেন—বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে যে এই যুক্তি দেখানো হয় তাহা সঙ্গতও নয়, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত তাহার সমর্থনও করে না।

ব্রাহ্মসমাজ বিধবার বিবাহ মানিয়া লইয়াছেন; কিন্তু সব বিধবাই সেখানে বিবাহিত হন নাই। মানুষের উপর বিশ্বাস হারাইয়া শুধু আইনের সাহায্যে তাহাকে ভাল করিবার প্রচেষ্টা মানুষের অন্তরাত্মার সঙ্গে বিদ্রোহমাত্র। মেয়েদের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিতে হইবে পরিবারসেবা, সমাজসেবা, বিশ্বসেবারূপ সমগ্রের উজ্জ্বল আলো; সেই আলোকে তাহারা স্থির করিয়া লইবে তাহাদের গন্তব্য স্থান ও চলার ছন্দ। এই সমগ্রতার, এই ব্যাপকতার আদর্শকে বিবাহিতা, অবিবাহিতা, বিধবা প্রত্যেক নারীজীবনের সামনে ধরিয়াই তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিশ্বসেবার সহিত যুক্ত না থাকিয়া কোন বিবাহিতা নারী নিজের পতিকে লইয়াও সতীত্ব রক্ষা করিতে পারে না। যেখানে সে একান্ত ভোগ্যারূপে গৃহীত, সেখানেই সে অসতী। কোনও নারী কি আজ সমস্ত দেহ মন প্রাণ দিয়া স্বামীর কাছেই নিজকে সমর্পণ করিতে পারিতেছে? তাহার পঞ্চকোষের ক্ষুধা, তাহার সমগ্র জীবনের ক্ষুধা কি বর্ত্তমানে তাহার ঘরে মিটিতেছে? সে কোন প্রকারে স্বামীর নিকট দেহ দান করিয়া সংসার করিতেছে মাত্র। তাই সেখানে ব্যাভিচার থাকিয়াই যাইবে, যদি সেই সঙ্গে ঘরের বাহিরে বিশ্বসেবার জীবন না থাকে। স্বামীসেবারূপ ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসেবারূপ সমষ্টির জীবনও যে একটী সমগ্র নারীজীবনের পক্ষে তুল্য সত্য। সেই সত্য আকাঙ্ক্ষার খোরাক না জোগাইলে উহা বিকৃত আকাঙ্ক্ষারূপে ব্যক্তি ও তথা সমাজদেহে আত্মপ্রকাশ করিবেই। এইজন্য প্রত্যেক নারী-জীবনের সামনে বিশ্বসেবার পথ খুলিয়া রাখিতেই হইবে। ঘরের সেবা ও বিশ্বের সেবা মিলিয়া মেয়েদের যে জীবন গঠন হইবে, সেই জীবনই আনিবে ঘরের কল্যাণ। নতুবা তাহাদের সহজ চলার পথকে আইনের তালা চাবী দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া ব্রহ্মচর্য্যের বোঝা চাপাইতে গেলে

তাহা ব্যর্থই হইবে। মানুষের চলার যদি ব্যাপক ক্ষেত্র না থাকে, সাধ্য কি সে সংযমী হয়? নারী যে স্বরূপতঃ শ্রীরাধা। বড় বড় কর্ম্মীজীবন দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। সকল দিকের মাত্রা বজায় রাখিয়াই তাহাদিগকে চলিতে হয়। সংযমী না হইলে বিশ্বসেবা করিবে কিরূপে? মানুষের জীবনের মূল কেন্দ্র যেখানে, যদি সেখান হইতে তাহাকে চলিবার পথ খুলিয়া না দেওয়া হয়, বাহির হইতে কতগুলি সুযোগসুবিধা প্রদানের দ্বারা কি জীবনের বাস্তব কোন সমস্যার স্থায়ী সত্যকার মীমাংসা হয়?

স্মৃতি—মেয়েরা যে পুরুষের সহিত স্কুল কলেজে যাইতেছে, বি-এ, এম্-এ পাশও করিতেছে, চাকুরী করিয়া টাকা আনিতেছে, আবার বিবাহিতা মেয়েদের আইনতঃ বিত্তে অধিকারও নাকি জন্মিতেছে—ইহাতেই কি মেয়েরা পুরুষের সমকক্ষ হইতেছে? নারী ও পুরুষকে তো বিধাতা সৃষ্টিই করিয়াছেন পৃথক করিয়া, সমকক্ষ হইবে তাহারা কোথায়? কিরূপে? নারী যদি সমকক্ষতার দাবী লইয়া বাহিরে চাকুরী করিতে বাহির হয়, ঘরের মাতৃত্ব রক্ষা করিবে কে?

শ্রুতি— দ্রষ্টা-দৃশ্যের সংযোগের যে তত্ত্ব পুরুষোত্তমদর্শন শুনাইয়াছে সেই সেই দার্শনিক ভিত্তির উপরই নারী পুরুষের সমকক্ষ হইবে। এই দার্শনিক ভিত্তির উপর যদি সমকক্ষতা স্থাপন না করা যায়, নারীর উপর যদি হেয়ত্বের আরোপ চলিতেই থাকে, তাহা হইলে শুধু স্কুল কলেজে যাইয়া, চাকুরী করিয়া কিম্বা বিত্তে অধিকার পাইয়াও সমকক্ষতা পুরাপুরি কার্য্যকরী হইবে না। পুরুষ এবং নারী যদি উভয়ের স্তর বদলাবদলি করিয়া উভয়ে উভয়কে দেখিতে পারে, তবেই হইবে সমকক্ষতার দাবী সার্থক, সমকক্ষতার দেনা-পাওনাও সার্থক। দ্রষ্টা-দৃশ্যের সংযোগের এতদিনকার অন্তর্নিহিত হেয়ত্ব মুছিয়া ফেলিয়া গৌরবময় প্রাণখোলা মিলনের ভিতর দিয়া পুরুষ-প্রকৃতির যে পারস্পরিক স্বীকৃতি—সেই স্থানেই নারী পুরুষের সমকক্ষ। এই সমকক্ষতা তত্ত্বতঃ সত্য। এই তাত্ত্বিক সত্যকে যে সমাজব্যবস্থা

ব্যবহারক্ষেত্র এই সংসারের খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা, পড়াশুনা, অর্থোপার্জ্জন, বিত্তে অধিকার প্রভৃতি ব্যাপারে যতখানি রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছে, সে সমাজ ততখানি ভদ্র, সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে। শুধু আইনের ব্যবস্থায়ই কি জীবন গঠিত হয়? আইন করিয়া মেয়েদিগকে বিত্তে অধিকার সমাজ দিতেছে, ভালই। তাহাদের অর্থের তো প্রয়োজন আছেই, কোন কোন স্থানে তো বিশেষরূপেই আছে। কিন্তু বিত্তে অধিকারের মূলে যদি প্রাণের অধিকার না পায়, সে বিত্তে কি মেয়েদের জীবনের সমস্যা মিটিবে? না তাহাদের হাতেই উহা থাকিবে? প্রাণই সমতা স্থাপনের কেন্দ্রস্থল। নারী প্রাণ দিয়া সংসারকে গড়িয়া তুলিবে, পুরুষ বুদ্ধি দ্বারা তাহার পরিচালনা করিবে।

নারী প্রাণ-প্রধান, পুরুষ বুদ্ধি-প্রধান; একটি পরিবার গঠনে উভয়ের অধিকারই সমান, ক্ষেত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। বিত্ত রক্ষা করা বা অর্থ উপার্জ্জন করা বাহিরের কাড়াকাড়ির মধ্যে বহু ঝঞ্ঝাটময়; সেখানে বুদ্ধির সুযোগই বেশী; তাহার উপর বাহিরের অত ছুটাছুটি কি মেয়েদের পক্ষে সব সময়ে সম্ভব? সেজন্য বিত্ত পুরুষের হাতে থাকিলে কোন ক্ষতি হইত না, যদি পুরুষ পুরুষোত্তমজীবনে জীবন মিলাইয়া অনুভব করিত যে বিত্তে অধিকার নরনারী উভয়েরই সমান, শুধু উহা অর্জ্জন ও রক্ষা করার ভারই প্রধানতঃ আমার উপর। স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ দেহের ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে অনেকখানি দুর্ব্বল, আবার প্রাণের ক্ষেত্রে তাহারা পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশি সবল, প্রাণের ক্ষেত্রে সে কন্যা, ভগ্নী, বন্ধু, স্ত্রী, মাতা। এই প্রাণের ক্ষেত্রেই নারীর নিজস্ব গৌরবের অধিকার। এই অধিকারের বিশেষ প্রকাশ হইল পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্ব-জীবন গড়িয়া তোলায়। সেখানে তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতেছে জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করা। প্রাণই সকলকে মিলাইয়া লইয়া চলিতে পারে, এই প্রাণের কাছে পুরুষকে নত

হইতেই হইবে। ঘরকে নারী প্রাণের স্পর্শ দিয়া গড়িয়া তুলিবে, পুরুষকে প্রাণবান করিয়া তুলিবে। পুরুষের জন্য বাহিরের বুদ্ধির ক্ষেত্রের ধাক্কা সামলাইবার, জুড়াইবার স্থান রহিয়াছে ঘরে নারীর হৃদয়ে। একজন সম্রাটকেও কর্ম্মের ক্লান্তি জুড়াইবার জন্য, সবলতা লাভ করিবার জন্য ঘরে নারীর হৃদয়কেই আশ্রয় করিতে হয়। সে নারী মাতা, ভগ্নী, বন্ধু, স্ত্রী, কন্যা। এই হৃদয়ের ক্ষেত্রে নারী রাণী। পুরুষ যখন এই হৃদয়ের নিকট আশ্রয় লয়, তখন নারী অগ্রগামী, প্রধান। আবার বুদ্ধির ক্ষেত্রে পুরুষ প্রধান ও অগ্রগামী, নারী তাহার পিছনে। একটী অখণ্ড পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্ব রচনায় উভয়েই উভয়ের ক্ষেত্রে প্রধান। এই বোধ, এই চিন্তাধারা যখন সমাজের ভিতর স্বাভাবিক ভাবে গৃহীত হইবে, তখনই হইবে নারীর সমকক্ষতা স্থাপন।

স্মৃতি—তোমাদের পুরুষোত্তমদর্শনে দুঃখিনী ধর্ষিতা নারীর স্থান সমাজে কোথায় জানিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।

শ্রুতি—জীবনের রক্ত-মাংসের ভিতর দিয়া শুচি-অশুচির যে মানদণ্ড সমাজে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে, সেই শুচি-অশুচির মাপ কাঠি দিয়া বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান বাহির করা যাইবে না। অত্যাচারিতদের কবলমুক্ত ধর্ষিতা মেয়েদিগকে সমাজে গ্রহণ করিবার বিধি আজ সমাজ-পতিরা দিয়াছেন। কিন্তু অতীতের শুচি-অশুচির সংস্কার মানুষের এতটুকুও বদলায় নাই অথচ কালের ধাক্কায় আবেষ্টনের চাপে মানুষ উহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইতেছে মাত্র। দীর্ঘদিনের সংস্কারও কিন্তু ভিতর হইতে তাহাদিগকে ধাক্কা দিয়া চলিয়াছে। একজন ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন— "গুণ্ডাদের কবলমুক্ত ধর্ষিতা নারীকে, সমাজপতিদের ব্যবস্থার জোরে ঘরে স্থান দিলাম বটে, কিন্তু সেই অপবিত্রা নারীকে "প্রাণ খুলিয়া" আদর করিব, গৌরব দিব কি করিয়া?" মেয়েরাই কি খোলাপ্রাণে ঠিক পূর্ব্বের মত ঘরে যাইতে পারিবে? সারা জীবন কি মেয়েরা অসতীত্বের গ্লানি

ও তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস অন্তরে অন্তরে বহন করিয়াই চলিবে না? সতীত্ব ও অসতীত্বের যে বিচারে তাহারা এতদিন অভ্যস্ত, সে বিচারে তো তাহারা অসতীই রহিয়া যাইতেছে। বাহিরের ব্যবস্থায় কি তাহাদের অন্তরের এই অসতীত্বের দাগ মুছিয়া যাইতে পারে? মেয়েরা ঘরে যাইবে, সমাজও ঘরে নিবে; কিন্তু তাহাদের প্রাণখোলা মিলন তো পূর্ব্বের মত আর প্রতিষ্ঠিত হইবে না, অন্তরের সংস্কার যে যেমন তেমনটিই রহিয়া গেল। বাইরের সংস্কারে অন্তরের সংস্কার বদলায় না। অন্তরের সংস্কার বদলাইতে চাই অন্তরের সাধনা। অন্তর ও বাহির উভয়েরই সংস্কার বদলাইতে হইবে।

ইহার সমাধান একমাত্র পুরুষোত্তম দর্শনের ভিতরই রহিয়াছে। পুরুষোত্তমদর্শনের দৃষ্টি ব্যতীত শুচি-অশুচির, সতীত্ব-অসতীত্বের যে প্রশ্ন বর্ত্তমানে উঠিয়াছে তাহার স্থায়ী মীমাংসা দেওয়া যাইবে না। মুনি গৌতমের ব্যবস্থায় অহল্যা অশুচি; তাই তাহার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ সে পাষাণী। গৌতমের শাস্ত্র "পাপোঽহম্ পাপকর্ম্মাহম্ পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ"—এই উক্তি হইতে রওয়ানা হওয়ায় মানুষ আগে পাপ, পাপকর্ম্মা, পাপসম্ভব; পরে পূণ্য কর্ম্ম দ্বারা পাপ-মুক্ত হইয়া, শুচি হইয়া সে ভগবানের হইতে পারিবে। মানুষ যে কবে কোথা হইতে কেমন করিয়া হঠাৎ পাপ হইতে উদ্ভূত হইল, তাহার খোঁজ এই শাস্ত্র দেয় নাই। এই শাস্ত্র মানুষের ভগবৎস্বরূপের স্তর হইতে সুরু না করিয়া শুধু পাপ কর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়াই করিয়াছে মানুষের বিচার, যাহার ফলে বর্ত্তমান সমাজে লক্ষ লক্ষ অহল্যা পাষাণে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, বর্ত্তমানের ধর্ষিতা নারীরাও পাষানী হইয়াই সমাজে থাকিবে। কাহার শ্রীচরণস্পর্শে তাহারা এই পাষাণত্বকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভক্তিপ্লাবিত হইয়া বিশ্বের প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া থাকিবে? সে শ্রীচরণ শুধু পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রেরই আছে।

শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টি অহল্যার পাপকর্ম্মের দিকে নয়; তাঁহার দৃষ্টি অহল্যার স্বরূপের দিকে। সত্যং শিবম্ সুন্দরম্ ভগবান হইতেই মানুষের উৎপত্তি; প্রত্যেক মানুষই যে স্বরূপতঃ চির পবিত্র। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ভগবান হইতে জাত মানুষ ভগবানের অংশরূপেই উদ্ভাসিত। "মমৈবাংশঃ জীবলোকে জীব ভূতঃ সনাতনঃ"—গীতা। মানুষের এই স্ব স্বরূপ হইতে মানুষকে দেখিলে বাহিরের যত কিছু অপবিত্র বা অশুচি তাহাকে স্পর্শ করুক না কেন, স্বরূপতঃ সে চির পবিত্র, স্বস্বরূপ তো তাহার ভাগবত সত্তাই। মানুষকে যখন এই দৃষ্টি দিয়া মানুষ দেখিতে শিখিবে, তখনই মানুষের সম্বন্ধে সত্য বিচার তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে। মানুষ এত পাপ করিতেই পারে না, যেখান হইতে অতি সহজে সে তাহার নিজস্ব স্বরূপ স্বসত্তায় ফিরিয়া যাইতে না পারে, যদি তাহার জীবনে পুরুষোত্তম-স্পর্শ লাভ হয়। মানুষ আগে মানুষ, তাই না মহাপ্রভু "কোথায় জগাই কোথায় মাধাই" বলিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল? আগে মানুষকে বুকে তুলিয়া লইয়া প্রাণের স্পর্শ দিয়া তবে তাহার পাপপুণ্যের বিচার।

পুলিশের দৃষ্টিতে চোর "চোর," কিন্তু মা বলিবেন "ও যে নীলমণি মোর"। ভাগবত ধর্ম্মের এই প্রাণপ্লাবনে কি যে পাপ, কি যে পুণ্য, তাহা বুঝিবার দিন আজ আসিয়াছে। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"। মানুষ পাপ হইতেও সত্য, পুণ্য হইতেও সত্য। এই খানে দাঁড়াইয়াই তো ভাগবতধর্ম্মে বারবনিতা চিন্তামণির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রচলিত চিন্তাধারার ভিতর থাকিয়া বুঝিবার উপায়ই নাই কি শুচি কি অশুচি। সদাশুচি পুরুষোত্তম চিন্তাধারায় যদি সমাজকে গড়িয়া তোলা যায়, তবেই শুধু সমাজে এই ধর্ষিতা মেয়েদের গৌরবময় স্থান মিলিতে পারে; নতুবা আইন, কানুন, যুক্তিতর্ক দ্বারা সমাজ তাহাদিগকে বর্ত্তমানে গ্রহণ করিলেও সত্যিকার মর্য্যাদা ধর্ষিতা নারীরা বর্ত্তমান সমাজে কিছুতেই পাইবে না। আজ প্রকৃতির

ভিতর দিয়া মানুষের ভাল-মন্দ শুচি-অশুচি, সতীত্ব-অসতীত্ব সমস্ত ভেদ ডিঙ্গাইয়া এক মনুষ্যত্বের স্তরে দাঁড় করাইবার জন্য ডাক আসিয়াছে। মানুষকে আজ সমগ্র প্রকৃত মানুষ হইতে হইতেই শুচি, সতী হইতে হইবে। অতীতের সমস্ত সু ও কু, শুচি ও অশুচির চাপ হইতে বর্ত্তমান সমাজের লক্ষ লক্ষ পাষাণীকে মুক্ত করিয়া তাহাদের স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপযোগী এই পুরুষোত্তম চিন্তাপ্রণালীর কৌশল শিখাইতে হইবে। এইজন্য চাই পুরুষোত্তম দর্শনের জ্ঞানধারা ও পুরুষোত্তম হৃদয়ের স্পর্শদ্বারা সমাজকে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা। অতীতের চিন্তাধারা বদলাইয়া না দিয়া কোন ব্যবস্থাই সমাজের স্থায়ী কল্যাণকর অবস্থা আনিতে পারিবে না। সমাজের স্বাস্থ্যকর অবস্থা আনিতে হইলে সমস্ত পুরুষ ও নারীকে এই পুরুষোত্তম দর্শনের আলোকে জীবনকে জ্ঞানে ও আনন্দে আলোকিত করিয়া তুলিতে হইবে। পুরুষোত্তম-জীবন লাভেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে। আমার সমস্ত আলোচনার ভিতর দিয়া এই জীবনবাদের কথাই আলোচিত হইয়াছে।

স্মৃতি—আজ তোমার নিকট বর্ত্তমান যুগোপযোগী পুরুষোত্তমদর্শন শ্রবণ করিয়া, পুরুষোত্তমদর্শনের আলোতে আমার নিজের ভিতরের দ্বন্দ্বের এবং বিশ্ব-প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল গতির মূলতত্ত্ব কোথায়, তাহা দেখিতে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম। পুরুষোত্তমদর্শনের দান যে অবধূত জীবন, সেই জীবনের আলো যেন আমার জীবনকে চুম্বন করিয়া এক মুক্তির আনন্দে ভরিয়া তুলিতেছে। সত্যই তুমি আজ আমার কাছে মুক্তির বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছিলে। আজ তোমাকে পাইয়া আমার উপবাসী মৃতপ্রায় প্রাণ পুরুষোত্তমামৃত পান করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তোমায় আর বেশী কি বলিব, ভাই। আমি আজ যে পুরুষোত্তম-জীবনের মন্ত্র তোমার নিকট পাইলাম তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া যেন তাহারই আলোকে সংসার ও সমাজের সেবা করিয়া সার্থক হইতে পারি।

শ্রুতি—স্মৃতি, তোমাকে পাইয়া, তোমার নিকট আমার প্রাণের বস্তু পুরুষোত্তমদর্শনের আলোচনা করিয়া আমি নিজেই ধন্য হইলাম বলিয়া বোধ করিতেছি। তোমার সহিত আমার বাল্যকালের যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল, তাহা আজ ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত হইল দেখিয়া কি যে আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা আর তোমাকে কি বলিব? কাহারও নিকট তো আমার প্রাণের বেদনার কথা বলিতে পারি না, বুঝাইতে পারি না প্রাণের বেদনা কি ও কেন। তোমার ভিতর জীবনের প্রশ্ন সাড়া জাগাইয়াছিল সেই জন্যই তোমার নিকট বলিবার সুযোগ পাইলাম। মানুষের ভিতর যদি মানুষ হইবার বেদনা না জাগে, তাহা হইলে প্রাণের এ-কথা, এ-বেদনা কেহই বুঝিবে না। আজ তোমার নিকট আমার প্রাণের দাবী জানাইয়া বিদায় লইতেছি। বাল্যে যে প্রীতি আমাদের ভিতর বীজাকারে ছিল, তাহা পুরুষোত্তমজীবনের প্রেমসলিলে সিঞ্চিত হইয়া মহান মহীরুহে পরিণত হউক, তাহার ছায়ায় তাপ-দগ্ধ নারী-জীবন জুড়াইয়া যাইবে। যে পুরুষোত্তমমন্ত্র আজ তুমি হৃদয়ে বরণ করিয়া লইলে, উহার দ্বারা বিশ্বসেবা করিয়া সার্থক হও, আমাকেও সার্থক কর। তুমি ঘরের ভিতর থাকিয়া বিদ্রোহী মেয়েদের ভিতর এই বিপ্লবের বীজ বপন কর, এই নারী-প্রগতির জন্মকথা শুনাও। আমি বাহিরে থাকিয়া এই বিপ্লবের বীজ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দেই। আমার এই বিশ্বসেবায় বাল্যবন্ধু তোমাকে সঙ্গিনী রূপে পাইয়া আমি পরম পরিতৃপ্ত। পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন।

নারীপ্রগতির জন্মকথা

শ্রীপ্রতিভা রায়

মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ভূমিকা

আমি প্রৌঢ়া বিধবা ; প্রাচীন চিন্তাধারার মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম। এই প্রাচীন সমাজব্যবস্থার অনেক ঝড় আমার জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাচীনের এই প্রাচীরের মধ্যেও কোন্ ছিদ্রপথে কি জানি কেমন করিয়া নবীন জীবনের হাওয়া প্রবেশ করিয়াছিল। নানা ঘটনা-বিপর্য্যয় আমাকে বর্ত্তমানকালের এই নবীন জীবনের প্রবর্ত্তক পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের পদপ্রান্তে আনিয়া ফেলিয়াছিল। শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের স্বাধীন স্বতন্ত্র উজ্জল জীবনদর্শনকে বুঝিতে পারিলাম তাঁহার জীবন ও দর্শন-ব্যাখ্যাতা শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের নিকট।

নিজের জীবনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান কালের নারীর জীবনের যেদিক ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার অপর দিক দেখিতে পাইলাম বর্ত্তমান সময়ের নারীপ্রগতির মধ্যে। নিজের বুকভরা বেদনা দিয়া ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। স্বামীজীর নিকট জীবনের সমগ্রতার, জীবনের গতি ও স্থিতি উভয় দিক সমন্বিত যে পরিপূর্ণতার খোঁজ পাইয়াছিলাম, তাহারই আলোকে বুঝিতে পারিলাম জীবনের স্থিতিভূমি হারাইয়া ফেলিয়া বর্ত্তমান নারীপ্রগতি কি অন্ধকারের মধ্যে ছুটিতে চাহিতেছে। নারীপ্রগতির কারণ কি, এবং কোথায় কিভাবে নারী তাহার স্বতন্ত্র স্বাধিকার লইয়া সমকক্ষতার দাবিকে সার্থক করিতে পারে, জীবনের একত্ব ও বহুত্বের আস্বাদনকে মিটাইয়াই সুস্থ সমাজজীবন যাপন করিতে পারে, পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের প্রবর্ত্তিত সমগ্র জীবনের আলোকে তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছি। সমগ্র জীবনের এই দৃষ্টিভঙ্গী বর্ত্তমানের স্বাতন্ত্র্য, ও স্বাধীনতাকামী হৃতগৌরবা পথহারা মেয়েদের পথের খোঁজ দিবে। এই আশা লইয়াই স্কুলকলেজের কোন শিক্ষা না থাকিলেও জীবনের এই শেষের দিনগুলিতে এই বই লিখিবার দুঃসাহস করিয়াছি। পুরুষোত্তম শ্রীনিত্য-গোপাল এই প্রগতিকে জয়যুক্ত করুন।

নরনারায়ণ আশ্রম
৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা
শ্রীনিত্যগোপালদেবের
শুভ-আবির্ভাব-তিথি
বাসন্তী অষ্টমী, ১৬ই চৈত্র, ১৩৫৩।

প্রতিভা রায়

—প্রকৃতিহননকারী যে ভারতবর্ষ নারীকে ব্রহ্মলাভ সাধনার একান্ত প্রতিবন্ধক করিয়া রাখিয়াছিল, সেই ভারতবর্ষের মঠের সুদীর্ঘ কালের বদ্ধ দুয়ার যিনি ভারতের নারী সমাজের কাছে উন্মোচন করিয়া পরিপূর্ণ জীবনের ক্ষেত্রে নারীকেও সাদর আহ্বান জানাইলেন, সেই পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল দেবের—যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের—শ্রীচরণতলে এই "নারীপ্রগতির জন্মকথা" সমর্পণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ করিলাম।—

নারীপ্রগতির জন্মকথা

বাল্যকালের দুই বন্ধু। বাল্যজীবনে উভয়ের প্রতি উভয়ের ছিল প্রগাঢ় প্রীতি। ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া বহুদিন দুইজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। দীর্ঘদিন পরে আজ তাহারা আবার একত্রিত হইয়াছে। অনেকদিন পর দেখা হওয়ায় বাল্যের সেই প্রীতি উভয়ের হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের একটির নাম স্মৃতি এবং অপরটির নাম শ্রুতি। স্মৃতির বিবাহিত জীবন, সে চলিয়াছে সামাজিক বিধিনিষেধ মানিয়া। শ্রুতি অবিবাহিতা, বর্ত্তমান সমাজের বাঁধন ছেঁড়া। দুই বন্ধুর জীবনধারা যদিও চলিয়াছে দুই পথে, তবুও বাল্যের সেই প্রগাঢ় প্রীতিতে কাল ক্ষয় ধরাইতে পারে নাই। চলার পথ দুই জনের পৃথক হইলেও কোথাও উহাদের গভীর ঐক্য ছিল। তাই দীর্ঘদিনের ব্যবধান অন্তরের ব্যবধানে পরিণত হয় নাই।

স্মৃতি বলিল—ভাই শ্রুতি, অনেকদিন পর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইল। সেই বাল্যকালে আমরা কত খেলাই না খেলিতাম, দুইজনে ভাবও ছিল খুব। কিন্তু ভাই তবু যেন তোমার সহিত আমার কোথায় অমিল ছিল। তখন বয়স ছিল অল্প, নিজকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারিতাম না, তাই বুঝিতে পারি নাই, আমাদের অমিলটা ছিল কোথায়। এখনই কি আর কিছু বুঝি? মনের ভিতর কত যে পরস্পর-বিরোধী ভাব আসিয়া দ্বন্দ্ব বাধায়, তাহার মীমাংসা কিছুই খুঁজিয়া পাই না।

শ্রুতি হাসিয়া বলিল—কিসের দ্বন্দ্ব মনে উঠে ভাই, বল না ?

স্মৃতি—বলিবই তো, অনেকদিন হইতে প্রাণের ভিতর তোমাকে চাহিতেছি। মনে ভাবি তুমি কোথায়। শুনিয়াছিলাম তুমি নাকি কোনও মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়া বিশ্ব সেবার জন্য নূতন যুগের পুরুষোত্তম-যোগ-দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছ। সেই হইতেই মনে হয় তোমাকে একবার নিকটে পাইলে প্রাণের সকল কথা বলিতাম। তোমাকে যখন আজ আমি পাইয়াছি, আমার জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর তোমার নিকট শুনিব।

শ্রুতি—সে তো খুব ভাল কথা ভাই। আমাদের দেশের মেয়েরা যেন একেবারে পুতুলের মত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের জীবনে যেন কোন সাড়া নাই, তাহাদের জীবনে যেন কোন প্রশ্ন নাই। সমাজের এত লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া চলিয়া, এত পরাধীনতার পাশে বদ্ধ থাকিয়াও তাহাদের জীবনে আত্মজিজ্ঞাসু ভাব, নিজকে ও বর্ত্তমান যুগকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মত মনোভাব বা আত্মচৈতন্য আসিতেছে না। তাহারা অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াই জীবনকে সার্থক করিতে চাহিতেছে, বর্ত্তমানের দাবী তাহাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর। আমার তো ভাই সেইজন্যই দুঃখ। এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার অমিল ছিল। আমি অতীত কিম্বা বর্ত্তমান কাহাকেও একান্ত করিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমি বুঝি জীবনের কথা, আমি বুঝি বিশ্বের কল্যাণের কথা। জগতের দিকে কি ভাই, একবার তাকাইয়া দেখিতেছ ? আজ আমরা কোথায় ? হৃদয়ের এই বেদনাতেই পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, আত্মীয়স্বজন সকলের সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাণকে ব্যথা দিয়া, চোখের জল সম্বল করিয়া পথে দাঁড়াইয়াছি ; বিবাহিত জীবন যাপন না করিয়া মহাপুরুষের আশ্রিতা হইয়াছি এবং তাঁহার শ্রীচরণতলে বসিয়া এই যুগ-সমস্যার সমাধান কোথায় তাহাই খুঁজিতেছি। তাঁহার

নিকট সমস্ত দর্শনশাস্ত্র-মন্থন-করা অমৃতময়ী বাণী আমি যতই শুনিতেছি, ততই আমার সমস্ত দেহ মন প্রাণ এক মুক্তির আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি একদিকে যেমন মুগ্ধ, আশার আলোকে যেমন বুক আমার ভরিয়া উঠে, অপরদিকে মানুষের অচল নিস্তব্ধ ভাব দেখিয়া ভয়ে হতাশায় বুক আবার ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। বল না ভাই স্মৃতি, চারিদিকের এই নিস্তরঙ্গ অবস্থার মাঝে তোমার বুকে কিসের তরঙ্গ উঠিয়াছে?

স্মৃতি—তোমাকে তো সে কথা বলিবই; তোমাকে সে সকল কথা বলিবার জন্য প্রাণ আমার ব্যাকুল। আচ্ছা, সেই মহাপুরুষের নিকট কি তুমি অতীত যুগের ও বর্ত্তমান যুগের সমন্বয়ে যে জীবন, সেই জীবনের সন্ধান পাইয়াছ?

শ্রুতি—তাঁহার জীবনই যে ভাই সমন্বয়ঘন; সেইজন্যই তাঁহার ভিতর দিয়া এই সর্ব্বসমন্বয়ঘন পুরুষোত্তম দর্শনশাস্ত্র স্ফুরিত হইতেছে। এই দর্শনশাস্ত্রই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ব সমস্যার সমাধান করিবে। তাঁহার জীবনের আলোর স্পর্শেই আজ সমাজের এই বীভৎস মরণের চিত্র এত পরিস্ফুট হইয়া আমার নিকট ধরা দিয়াছে। চোখের সামনে সমাজের এই ধ্বংসোন্মুখ চিত্র প্রাণটাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। ধ্বংসোন্মুখ এই সমাজকে রক্ষা করিবার কৌশল তাঁহার জীবন ও তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যার ভিতর রহিয়াছে। কিন্তু কেমন করিয়া যে সমাজের বুকে এই কৌশল-বীজ ছড়াইয়া পড়িয়া মানুষকে কল্যাণের পথ, শান্তির পথ, বাঁচিবার পথ দেখাইবে, তাহাই ভাবি। মানুষ যে কত অসহায়, তাহা তো সে বুঝিয়াও বোঝে না। অতীতের চিন্তাধারার খুঁটায় বাঁধা মন তাহাদের; বর্ত্তমানের টানে অতীতের খুঁটা গিয়াছে উপড়াইয়া, কিন্তু অতীতের দড়ি তো গলাতেই রহিয়াছে। মানুষ পড়িয়াছে মুস্কিলে; অতীতও গিয়াছে তাহার আল্‌গা হইয়া, বর্ত্তমানকেও সে লইতে

পারিতেছে না, কেননা বর্ত্তমান যুগের চলার দর্শন সে আজও পায় নাই। অতীত বলে—আমি একান্ত অতীতই থাকিব; বর্ত্তমান বলে—আমি একান্ত বর্ত্তমানই হইব। উভয়ে উভয়কে অস্বীকার করিয়া চলিতে চায় বলিয়াই যত গোলমাল। উভয়কে যদি উভয়ে স্বীকার করিয়া লইয়া চলিতে পারিত, তাহা হইলে সমস্যা মিটিয়া যাইত। পরস্পর পরস্পরকে স্বীকার করিয়াই শুধু সত্য বাস্তব হইতে পারে; নতুবা অর্দ্ধ-সত্যের মধ্যে অপর অর্দ্ধ লুকাইয়া থাকিয়া তাহার বাস্তবতাকে একদিন ব্যর্থ করিয়া দিবেই। অতীতের বুকের ভিতর দিয়াই বর্ত্তমানের সৃষ্টি, অতীতের অভিজ্ঞতার ফলই বর্ত্তমান; তাহা হইলেও তাহার একটা স্বতন্ত্র মূল্য রহিয়াছে। এ জগতে সকলই স্বয়ম্; কাহাকেও অস্বীকার করিলেও কেহ অস্বীকৃত হইবে না। অতীত অতীত থাকিবেই, বর্ত্তমানও বর্ত্তমান থাকিবে; চাই শুধু দুইয়ের মিলনকৌশল জানিয়া সেই ঢংএ বিশ্বকে গড়িয়া তোলা, সেই ছন্দে জীবনপথে চলা। এই দুইয়ের উপরের যে শাস্ত্র এবং মানুষ—তাঁহারাই দিবেন ইহার মীমাংসা। এইজন্যই আমার যিনি আচার্য্য, তিনি উৎ-আসীন হইবার কথা, উপরের স্তরে উঠিবার কথা খুব বলেন। তাই তো ভাবি স্মৃতি, কেমন করিয়া এই দীর্ঘদিনের চিন্তাধারা, যাহা মানুষের ভিতর শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, তাহাকে বদলাইয়া দেওয়া যায়। আচ্ছা, তোমার কথা বল শুনি।

স্মৃতি—তোমার কথা শুনিয়া আমার মনে হইতেছে, অতীত ও বর্ত্তমানের দ্বন্দ্বই বুঝি আমার জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে। ভাল মেয়ে, ভাল বৌ তো হইয়াছি; কিন্তু প্রাণ যেন ইহাতেও তৃপ্ত নয়; সে যেন কোথায় নিজকে অসহায় ও অপমানিত বোধ করে। মন যেন কেমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চায়। ইহার কারণ কি, বল তো ভাই?

শ্রুতি—তোমার ভিতর যে ভাল মেয়ে, ভাল বৌ সাজিবার প্রচেষ্টা,

উহা অতীতের সংস্কার। অতীতের মেয়েরা শুধু ভাল হইতেই চাহিয়াছে। স্বামী তাহাদের যত অযোগ্য, অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য, অসচ্চরিত্র বা অত্যাচারীই হউক না কেন, পতিব্রতা স্ত্রী বিনা বিচারে সেই স্বামীকে দেবতাবুদ্ধিতে সেবা করিয়াই যাইবে; স্বামী যত অযৌক্তিক, অসঙ্গত কথাই বলুক না কেন, পতিব্রতা নারী পতির আজ্ঞা পালনের জন্য নির্ব্বিবাদে তাহা পালন করিবে—ইহাই হইল অতীতের ভাল মেয়ে, ভাল বৌদের সতীত্বের মাপকাঠি। অতীতের এই সতীত্বের একটী গল্প আছে। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুষ্ঠ ব্যাধিতে পঙ্গু, চলচ্ছক্তিহীন। একদিন তাহার নগরের লক্ষহীরানাম্নী বারবনিতার নিকট যাইবার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছার কথাও তাহার স্ত্রীকে সে জানাইল। তাহার পতিব্রতা স্ত্রী তখন পতির এই অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে উক্ত বারবনিতার চিত্ত আকৃষ্ট করিতে প্রতিদিন রাত্রিশেষে যাইয়া ঐ বারবনিতার উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া আসিত। কয়েকদিন এইরূপ করার পর একদিন লক্ষহীরার দৃষ্টি উক্ত ব্রাহ্মণ-পত্নীর উপর পড়িল। সে তাহার এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ-পত্নী অতি বিনয়সহকারে তাহার কুষ্ঠব্যাধিতে পঙ্গু স্বামীর অভিলাষ তাহাকে জানাইল। লক্ষহীরা সেই কথা শুনিয়া তাহার স্বামীকে লইয়া আসিবার জন্য বলিয়া দিল। পতিব্রতা ব্রাহ্মণ-পত্নী তখন পঙ্গু স্বামীকে কোলে করিয়া লক্ষহীরা বারবনিতার গৃহে লইয়া আসিল—ইহাই হইল অতীতের পতিব্রতার আদর্শ। তাহাদের জীবনে কোন বিচার ছিল না। মেয়েদের জীবনের বিচারের প্রসঙ্গই ভাগবতে উঠিয়াছে। যেদিন পূর্ণিমা রজনীতে বংশী-নিনাদ করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীকুলকে ঘরছাড়া করিয়া যমুনার তীরে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন, সেইদিন তিনি উপদেশের ছলে, পরিহাস করিয়া কি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতই না গোপীগণকে করিয়াছিলেন!

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্‌॥
দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥ ভাগবত

হে কল্যাণীগণ, প্রাণ খুলিয়া ভর্ত্তার শুশ্রূষা এবং তাহার বন্ধুদের ও প্রজাদির অনুপোষণই স্ত্রীলোকদের পরধর্ম্ম। দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, রোগী এবং অধন অপাতকী পতিকে মোক্ষাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রী কখনও ত্যাগ করিবেন না।

শ্রীকৃষ্ণ ঘরের বাহিরে গোপীদের টানিয়া আনিয়া পুনরায় এইরূপ উপদেশ দেওয়ায় ইহা বেশ বুঝাইতেছে যে, দুঃশীল দুর্ভগ স্বামী লইয়া পতিব্রতা হওয়ার পরধর্ম্ম (?) তিনি সমর্থন করেন না। তিনি প্রত্যক্ষে ঘরে ফিরিবার কথা বলিলেও পরোক্ষে উহার ব্যর্থতার ইঙ্গিতই করিয়াছিলেন। তিনি যদি উহা সমর্থনই করিতেন, তাহা হইলে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীদের মত ব্রজগোপীগণকেও বুঝাইয়া ঘরে পাঠাইতে পারিতেন এবং ব্রজগোপীগণও তাঁহার কথা শুনিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতেন। তাহা না করায় ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উপহাস করিয়াই ব্রজগোপীদের তিনি ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, রোগী ও অধন, অপাতকী (?) পতির দল নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি "স্বামিত্বের" সাদা চেক সহি করিয়া নারীর উপর অবাধ লুণ্ঠন চালাইতেছে—এই ইঙ্গিতই সেদিন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া বিশ্বের নারীকুলকে দিয়া গিয়াছেন। দুঃশীলতা, দুর্ভাগ্য, বার্দ্ধক্য, জড়ত্ব, রোগিত্ব ও নির্ধনতা এতদিন স্বামীদের পক্ষে "পাতক" বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। স্বামী হইলেই হইল; সব মহাপাতকও তখন অপাতক। শ্রীকৃষ্ণ দুঃশীলতা প্রভৃতিকে স্বামীর পক্ষে "পাতক" বলিয়াই মনে করেন। "অপাতকী" শব্দ ভাগবতে শ্লেষার্থেই প্রযুক্ত

হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই ধাক্কাই অতীত জীবনের সহিত বর্ত্তমানের এই দ্বন্দ্ব বাধাইয়াছে। একজন ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত কিম্বা একজন ক্লীব পতির সহিত ১০।১২ বৎসরের মেয়ের বিবাহ দিয়া সমাজপতির দল সেই স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবার উপদেশ দান করিয়া উক্ত মেয়েটীকে স্বামীর ঘর করিতে পাঠাইয়া দেয়। তখন সেই মেয়েটী তাহার জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চাপিয়া রাখিয়া স্বামীর ঘর করিতে থাকে। সেখানে তাহার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন প্রশ্ন নাই; আছে শুধু ভাল মেয়ে, ভাল বৌ হইবার নীতি। প্রাণ কি তাহা মানিতে পারে? প্রাণবান্ মানুষ বলিবে—আমিও তো মানুষ, মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার আমারও আছে। এত অবিচার প্রাণ সহ্য করিতে পারে না। প্রাণের রহিয়াছে অধিকারের দাবী। বর্ত্তমান কালে প্রাণ তাহার দাবী বিশ্বদরবারে উপস্থিত করিয়াছে। আমি নারীজাতি বলিয়া আমার কোন অধিকার নাই—একথা আর শুনিব না। নারী-জীবনেও আশা-আকাঙ্ক্ষা, মান-মর্য্যাদা সমস্তই রহিয়াছে। নারী-জীবনের সকল বৃত্তিগুলিকে স্বাধীনভাবে স্ফুরিত হইতে দিতে হইবে এবং তাহার মান-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাকে সমাজে চলিবার অধিকার দিতে হইবে। ইহাই বর্ত্তমানের প্রাণের সমকক্ষতার দাবী, যাহার জন্য ভাল বৌ, ভাল মেয়ে হইয়াও তোমার প্রাণ তৃপ্ত নয়, সে বিদ্রোহ করিতে চায়। প্রাণের দাবীর ধাক্কায়, অতীতের বিচারহীন সতীত্ব আর চলিতেছে না, চলিবেও না।

স্মৃতি—আচ্ছা ভাই, দেখিতেছি তো স্বামী ও অন্যান্যরা আদরও করেন, খানিকটা স্বাধীনভাবে চলাফেরাও করি; খুব একটা অসম্মান, পরাধীনতার কথা বিশেষ বুঝিতেও পারি না। কিন্তু তবুও প্রাণের ভিতর নিজকে অসহায়, অপমানিত বোধ করি কেন? আর এই যে অতীতের ভাল মেয়ে, ভাল বৌ হইয়া বিচারশূন্য অবস্থায় সকল অবিচারকে মানিয়া

লইবার মত মনোবৃত্তি—এ মনোবৃত্তিই বা নারীজীবনে কোন্ স্থান হইতে কেমন করিয়া শিকড় গাড়িল?

শ্রুতি—এদেশে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রবর্ত্তন হওয়ায় বাহিরের দিক দিয়া একটা চাপাচাপির ভাব কমিয়া গিয়াছে, অবশ্য তাহাও সহর জীবনে। পল্লীর অন্তরালে বহু সংস্কার এখনও লুকাইয়া আছে। বর্ত্তমানে বাহিরে অনেকটা স্বাতন্ত্র্যলাভ মেয়েদের হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যে চিন্তাধারার উপর সমাজ গঠিত, তাহার কোন পরিবর্ত্তন না হওয়ায় বাহিরে তোমাকে সংসার যতই আদর দেখাক না কেন, তুমি সংসারের নিকট ভোগ্যরূপেই শোষিত হইতেছ। যত কিছু ভাল উপাধি দিয়া তোমাকে সবাই শোষণ করিতেছে; কিন্তু তোমার ভিতর যে তোমার নিজস্ব স্বাধীন সত্তা রহিয়াছে, সে তাহার সম্মান না পাইয়া, নিজকে শোষিত হইতে দেখিয়া, নিজকে অপমানিতই বোধ করিতেছে। বর্ত্তমানে মেয়েরা যে স্বাধীনতা বা শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে তাহাদের নিজস্ব গৌরবমণ্ডিত যে স্বাতন্ত্র্যবোধ, তাহা জাগ্রত হয় নাই। তাহার কারণ তাহাদের স্বাধীনতা, তাহাদের শিক্ষা তাহাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাধারা স্ফুরিত করিতে পারে নাই। অতীতের চিন্তাধারার ফলে আজও মেয়েরা মনে করে, পুরুষ ছাড়া তাহাদের চলার উপায়ই নাই, পুরুষেরাও মনে করে তাহাদের বাদ দিয়া মেয়েরা চলিতেই পারে না; অথচ মেয়েদের বাদ দিয়া তাহাদের চলায় কোন ব্যাঘাতই হয় না। এই অসমকক্ষতার ফলেই মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য নাই, তাহারা পুরুষের দাসী মাত্র। বাহিরে একটা স্বাতন্ত্র্যের মত আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু ভিতরে প্রত্যেক নারীই একান্তভাবে পুরুষের অধীন। এই মনোবৃত্তি, এই চিন্তাধারা তাহাদের ভিতর রহিয়াই গিয়াছে। সে এমন গোপনভাবে মানুষের রক্ত মাংসের ভিতর লুকাইয়া আছে যে মানুষ তাহা ধরিতেও পারে না। আমরা বহুদিন মনে করিয়াছি বৃটিশের রাজ্যে আমাদের কিসের

অভাব? আমরা তো বেশ স্বাধীনভাবেই বাস করিতেছি; কিন্তু কোন্ অলক্ষ্যে যে আমাদের বল-বীর্য্য-ধন-মান সমস্ত শোষিত হইয়া যাইতেছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের অভাব হইয়াছে আমাদের স্বাধীন প্রকৃত "আমি"র। মেয়েরাও এইরূপ স্বাধীনতাই পাইয়াছে। চিন্তাধারার ভিতর দিয়া কোথায় যে তাহারা ছোট হইয়া রহিয়াছে বা পুরুষেরা ছোট করিয়া রাখিয়াছে, তাহা পুরুষ কিম্বা নারী কেহই বুঝিতে পারিতেছে না। শাস্ত্রের এক খোঁচায় মেয়েরা ন স্বাৎ হইয়া গিয়াছে। এই অসমকক্ষতার গ্লানিই আজ বহু নারীর জীবনে সাড়া আনিয়াছে; তোমার ভিতরেও সেই সাড়াই জাগিয়া উঠিতে চাহিতেছে। সেইজন্য তোমার প্রাণ শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চায়। ইহাই তো ভাই, বর্ত্তমান বিকৃত সমাজের গোড়ার কথা। যেদিন হইতে সমাজে এই শোষণ নীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে, সেইদিন হইতেই সমাজ বিকৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ সকল ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এই শোষণ নীতি। স্বামী-স্ত্রীতে, নর-নারীতে, রাজা-প্রজায়, গুরু-শিষ্যে, ধনিক-শ্রমিকে সর্ব্বত্র চলিয়াছে শোষণ। এই শোষণের জন্যই প্রকৃতির সকল স্তরে, সকল ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ঘনীভূত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। এই ব্যাপক সমস্যা ও তাহার সমাধানই পুরুষোত্তমদর্শনের ভিতর পাইতেছি।

আজ পর্য্যন্তও নারী নরকের দ্বার, দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত। দুঃখ হয় স্মৃতি, এই সকল উপাধির অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়াও নারীজাতি বেশ আরামে, আনন্দে দিন কাটাইতেছে। পুরুষ কতকগুলি বস্ত্র অলঙ্কারের প্রলোভন দেখাইয়া প্রতিদিন তাহার আত্মাকে অপমানিত করিতেছে; সেদিকে কি মেয়েদের দৃষ্টি আছে? সমাজব্যবস্থার গোড়াতেই মেয়েদের ছোট করিয়া রাখা হইয়াছে। সেইজন্যই মেয়েদের পুরুষ ছাড়া চলার উপায় নাই—এই বোধ প্রত্যেক পুরুষের এবং প্রত্যেক মেয়ের মনোভাবের ভিতর বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

কোনও ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ব্রাহ্মণী নহেন; নারায়ণপূজা ব্রাহ্মণ করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণীর নারায়ণকে ছুঁইবার অধিকার পর্য্যন্ত নাই। নারায়ণ হইলেন পুরুষদের নির্ম্মল লোকের দেবতা; শেষে স্ত্রীলোকের স্পর্শে যদি অপবিত্র হন! ব্রাহ্মণেরা আহার করিতে বসিলে ব্রাহ্মণীরা যদি ব্রাহ্মণকে সেই সময় স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আহার নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু গ্রীষ্মের রৌদ্রে আগুনে পুড়িয়া, ঘামে ভিজিয়া রান্না করার বেলায় প্রয়োজন আছে ব্রাহ্মণীর। প্রণব গ্রহণে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই, তাই কুলগুরুগণ মেয়েদের মন্ত্র দিবার বেলায় প্রণব ও স্বাহা শব্দ ব্যবহার করেন না। এমনই করিয়া কত নিয়মনিষেধের বেড়া দিয়া নারী জাতিটাকে ছোট করিয়া, পঙ্গু করিয়া দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরুষদিগের পদস্খলনে কোন দোষ নাই, নারীর সামান্য পদস্খলনও সমাজে অমার্জ্জনীয়। প্রকৃতি স্বভাবতঃই হেয়া, দুষ্টা কিনা! সমাজ তাই তাহাকে নানা প্রকারের শাসনের ভিতর রাখিয়াছে। মেয়ে একটু বড় হইলেই বিপদ; তাহাকে একটী পুরুষের হাতে রক্ষার জন্য দিতেই হইবে। মেয়েরা স্মৃতির ব্যবস্থায় পণ্য দ্রব্যে পরিণত। সমাজে তাহাদের সম্মান নাই কোথাও। এই অপমানবোধ তাহাদের নাই বলিয়াই মিথ্যা ভাল-র আবরণে সে প্রতিদিন শোষিত হইতেছে; আত্মা তার প্রতিনিয়ত অপমানিত হইয়া আজ বিদ্রোহের রূপ ধারণ করিয়াছে। তোমার মনের ভিতর যে অপমানবোধ ও বিদ্রোহের সাড়া পাও, তাহার নিগূঢ় কারণও ইহাই। কিন্তু বিদ্রোহে তো ইহার মীমাংসা হইবে না; চাই জীবনকে বিপ্লবের মাঝে ফেলিয়া দেওয়া। সকল প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে অভিযানের আদর্শমূর্ত্তি বিপ্লবময়ী শ্রীরাধাপ্রকৃতি।

স্মৃতি—আচ্ছা, নারী-পুরুষের মধ্যের এই অসমকক্ষতার মূল কোথায়? বিশিষ্ট মহাপুরুষেরাও তো ভগবানকে পাইতে হইলে কামিনী-কাঞ্চন

ত্যাগের কথাই বলিয়াছেন। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কোথা হইতে নারী-জাতির উপর এই হেয়ত্ব আরোপিত হইল, কেন হইল, এবং সত্যই নারী এত হেয় কিনা। তোমাদের পুরুষোত্তমদর্শন ইহার সম্বন্ধে কি বলিতেছে?

শ্রুতি—নারী-পুরুষের এই অসমকক্ষতার মূল আমাদের শাস্ত্রের ভিতরই রহিয়া গিয়াছে। যুগে যুগে শাস্ত্রের ভিত্তির উপরেই গড়ে সমাজ। বর্ত্তমানে আমরা সমাজের যে কাঠামোর মধ্যে বাস করিতেছি, তাহার মূলও শাস্ত্রের মধ্যেই নিহিত। পাতঞ্জলদর্শন দ্রষ্টা পুরুষ এবং দৃশ্যা প্রকৃতির সংযোগটাকেই হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, দ্রষ্টাকে ঐ দার্শনিকগণ জ্ঞানময় নির্ম্মল পুরুষরূপে দাঁড় করাইয়াছেন এবং ঘটনাবহুল দৃশ্যা প্রকৃতিকে তাঁহারা মলিনা, হেয়া বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। এই মলিনা, হেয়া দৃশ্যার সহিত যখনই নির্ম্মল দ্রষ্টার সংযোগ হয়, তখনই নির্ম্মল দ্রষ্টা মলিন, হেয় হইয়া যায়। কেমন করিয়া কবে যে এই মলিনা দৃশ্যের সহিত নির্ম্মল দ্রষ্টার সংযোগ হইয়াছে, তাহা তাঁহারা জানেন না। এখন এই নির্ম্মল দ্রষ্টাকে নির্ম্মল হইতে হইলে, মলিনা দৃশ্যের সংযোগ হইতে তাহার মুক্ত হইতে হইবে। এই দর্শনকে ভিত্তি করিয়াই নারী জাতির উপর এই প্রকার হেয়ত্ব আরোপ করা হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রে পুরুষ-প্রকৃতিতে যে তাত্ত্বিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, বাস্তব জগতের নরনারীসম্বন্ধও সেই আলোকে নির্ণীত হইয়াছে। সেইজন্যই এই বাস্তব জগতের পুরুষ দ্রষ্টা ও ভোক্তা, নারী দৃশ্যা ও ভোগ্যা। পুরুষোত্তমদর্শন বলিবে—দ্রষ্টা যদি এত নির্ম্মলই, তাহা হইলে দৃশ্যের মলিনতা তাহাকে স্পর্শ করিল কেমন করিয়া? নির্ম্মল দ্রষ্টার যখন মলিনা দৃশ্যের সহিত সংযোগ হইতেছে, তখন নির্ম্মল দ্রষ্টার ভিতরও এমন একটা কিছু প্রবণতা নিশ্চয়ই আছে যাহার ফলে দৃশ্যের মলিনতা তাহাতে সংক্রামিত হইতে পারিয়াছে।

ঐ প্রবণতা নিশ্চয়ই নির্ম্মলতা নহে। যেমন রোগের বীজাণু—বীজাণু কি সকলের ভিতরেই প্রবেশ করিতে পারে? যাহার ভিতরে বীজাণুকে গ্রহণ করিবার মত প্রবণতা থাকে, তাহার ভিতরেই সেই রোগের বীজাণু প্রবেশ করিতে পারে। নির্ম্মল দ্রষ্টার ভিতরেও মলিনা দৃশ্যের সহিত মিলিবার মত প্রবণতা একটা ছিল বলিয়াই এ মিলন সম্ভব হইয়াছে। দ্রষ্টাকে যেভাবে উঁহারা নির্ম্মলরূপে দাঁড় করাইয়াছেন, স্বরূপতঃ দ্রষ্টা সেভাবে নির্ম্মল নয়। কেমন করিয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মিলন মলিন না হইয়া নির্ম্মল হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার এবং বিশ্বকে সেই কৌশল শিখাইবার জন্যই বৃন্দাবনে নবীন মদন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মদনমোহন লীলা। তাঁহাদের জীবনে বিশ্ব দেখিয়াছে দ্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্যা প্রকৃতি কেমন করিয়া, কোন্ যুক্তিতে উভয়ে পৃথক, সমকক্ষ ও অদ্বৈত হইয়া নির্ম্মল সংযোগে সংযুক্ত হইতে পারে। নারী যে নরকের দ্বার নয়, সেও যে ব্রহ্মময়ীরূপে ফুটিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত পরাপ্রকৃতি রাধারাণী। যে কৌশলে অপরা নারী প্রকৃতি নরকের দ্বার না হইয়া ব্রহ্মময়ী পরা প্রকৃতি হইতে পারে, আমাদের সমাজ-কাঠামো গড়িবার সময় আমাদের সমাজ প্রবর্ত্তকগণ সে কৌশলের আশ্রয় লন নাই। নিজেদের দুর্ব্বলতা অর্থাৎ প্রকৃতিকে হজম করিয়া পরা প্রকৃতিরূপে গড়িয়া তুলিবার যোগ্যতা না-থাকা রূপ দুর্ব্বলতাকে পুরুষ নানা প্রকারে প্রকৃতির ঘাড়ে চাপাইয়া তাহাদিগকে সমাজে হেয় করিয়া তুলিয়াছে এবং নিজদিগকে নির্ম্মল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপ্রথমে নারীজীবনের উপর হইতে এই চাপ সরাইয়া তাহাদের ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তি জগতের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব বলিয়াছিলেন যে, বৃন্দাবনের রাসলীলা শ্রবণ করিলে জীবের কাম দূরীভূত হইয়া যাইবে। নারী-পুরুষের কাম কামরূপে থাকিবে অথচ তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইবে না, তাহাদের সেই কাম বিশ্বকে

ধ্বংস করিবে না, সে কাম মুক্তিপথের বাধা হইবে না, সে কাম হইবে বিশ্ব-সেবার উপাদান, সে কামে গড়িয়া উঠিবে উজ্জ্বল বিশ্ব। পুরুষোত্তমদর্শনে পুরুষ-প্রকৃতির এই নির্ম্মল অনবদ্য সংযোগের কথাই রহিয়াছে।

স্মৃতি—কাম তো একটা রিপু; কামত্যাগের কথা সেইজন্য সবাই বলিয়াছেন। কামকে কাম রাখিয়া সংসারে নারী-পুরুষ মিলিয়া চলিতে গেলে উচ্ছৃঙ্খলতা তো আসিবেই। তুমি বলিতেছ নারী-পুরুষের কাম কামরূপে থাকিবে, অথচ উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিবে না,—ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

শ্রুতি—কাম ব্যক্তিগত জীবনে রিপুই বটে; এই কামকে ত্যাগ করিতেই হয়। কিন্তু পরিত্যাগের যে পথ ইঁহারা লইয়াছেন, ঐ পথে কাম ত্যাগ হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। অস্বাভাবিক রূপে কামকে দমন করিতে গেলে আঘাতের পর আঘাত খাইয়া কাম দেহ-যন্ত্রকে বিকল করিয়া দিবে; ফলে আসিবে জীবনে অবসাদ, আসিবে জীবনে ক্লীবত্ব। কামকে যে দমন করিবে, তাহাকে চিনিবে কিরূপে, কাম তো অনঙ্গ। শিবের মদন-ভস্মের কথা শুনিয়াছ তো? শিব যখন মদনকে ভস্ম করিলেন, তখন মদন হইলেন অনঙ্গ অর্থাৎ যাহার অঙ্গ নাই। অঙ্গহীন কাম বিশ্বের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে; অঙ্গ থাকিলেও না হয় মানুষ তাহাকে চিনিতে পারিত, ধরিতে পারিত। এখন কাম অঙ্গহীন, তাহাকে আর ধরাই যাইবে না। কাম যদি কল্যাণের রূপে আসে, তখন তাহাকে চিনিবার মত বুদ্ধি কি মানুষের আছে? শত্রু অনেক সময় মিত্ররূপে আসে; অজ্ঞান-অন্ধকারে যে মানুষ রহিয়াছে, সে তাহা বুঝিবে কিরূপে? মহীরাবণ যখন রাম-লক্ষ্মণকে হরণ করিতে বিভীষণের রূপ ধরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন রামভক্ত হনুমানও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সাধারণ মানুষের বুঝিবার তো সাধ্যই নাই।

কামকে রিপুবুদ্ধিতে বাহির হইতে যতই চাপ দিবে, সে গোপন পথে ততই জীবনকে আক্রমণ করিবে। তাই না ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন—"নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি"? নিগ্রহ করিয়া কাম দমন করা যায় না। কাম তো কেবল ইন্দ্রিয়বিশেষের মধ্যেই নাই; কাম রহিয়াছে বিশ্বে সব কিছুর মধ্যে ছড়াইয়া। কামনাই কাম; নিজের তৃপ্তির জন্য ভোগ করিবার যে দুর্ব্বার বাসনা, তাহাই কাম। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম"। এই বিশ্বকে যখনই নিজের আত্মা হইতে পৃথক করিয়া রাখিলে, তখনই কাম বিকৃতরূপে তোমাকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিবে। যেদিন ব্যক্তিগত জীবন হইতে পরিবারজীবন, সমাজজীবন, জাতীয় জীবন ও বিশ্বজীবনকে মানুষ বাদ দিল, সেই দিন হইতেই কাম তাহাকে রিপুরূপে আত্মসাৎ করিল। কামদমনের পথ হইতেছে বিশ্বরূপ জীবন যাপন করা। বিশ্বরূপের ক্ষেত্রেই কাম দমন হয়। বিশ্বকে ব্যক্তিগত জীবন হইতে বাদ দিলেই কামদমনের প্রশ্ন উঠে; নতুবা যিনি বিশ্বকর্ম্মী, তাঁহাকে কাম আটকাইবে কোথায়? যাঁহাকে দিন রাত্রি পরিবারের ভাবনা, সমাজের ভাবনা, জাতির ভাবনা, বিশ্বের ভাবনা ভাবিতে হয়, তাঁহার কাম তাঁহাকে মোহিত করিবে কি করিয়া? একজন লিখিয়াছিলেন—"যীশুখৃষ্টের বিশ্বের সহিত বিবাহ হইয়াছিল"; তাই যিনি বিশ্বপ্রেমে পাগল, বিশ্বের সকলের সহিত একাত্ম ভাব হইয়াছে যাঁহার, বিশ্বের সকল রূপের সহিত যিনি যুক্ত, তাঁহার জীবনে ব্যাপক বিশ্বের কোন ঘটনাকেই তিনি বাদ দিয়া চলিতে পারেন না। বিশ্বসেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। এইরূপে বিশ্ব-রূপের সহিত মিলন হইয়াছে যাঁহার, তাঁহারই জীবনে কাম, কাম থাকিয়াও অকাম, সর্ব্বকাম ও মোক্ষকাম; কাম তখন রিপু নয়, কাম তখন যোগায় জীবনের প্রেরণা।

ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন। কি বিরাট্, কি বিশ্বরূপ

জীবন তাঁহার, যাঁহার জীবনে বিশ্বের সকলের সকল দাবী পূর্ণ হইয়াছিল! মদনমোহন তিনি, প্রতিক্ষণে তিনি নবীন মদন রূপে ছুটিয়া চলিয়াছেন। বৃন্দাবনে কি ছুটাছুটির লীলা তাঁহার! তিনি কখনও মা যশোদার কোলে, কখনও সখাদের সহিত গোচারণে, কখনও আবার ব্রজগোপীগণের সহিত মধুর রসাস্বাদনে রত। কখনও পশুপক্ষীর নয়নানন্দ রূপে, কখনও মুনি ঋষিদের যোগেশ্বর রূপে, আবার কখনও পুতনাদির মুক্তিদাতা রূপে। তিনি কখনও নাবিক, কখনও কোটাল, কখনও নাপিত, কখনও মালাকার। আবার তিনিই কৃষ্ণকালী রূপে, তিনিই আবার সূর্য্য পূজার পুরোহিত রূপে। তিনি কখনও ব্রজগোপীর অঙ্গনে নৃত্যপরায়ণ বাল গোপাল, কখনও কালীয় নাগের মস্তকোপরি নৃত্য রত। আবার তিনি গোবর্দ্ধনধারী, পিতা নন্দের বাধা বহনকারী, মা যশোদা কর্তৃক বন্ধনকাতর, শ্রীরাধার চরণতলে মান ভিখারী। সেই কৃষ্ণই আবার অক্রূরের রথে মথুরার পথে ব্রজগোপীদের করুণ দৃশ্য দর্শনকারী। আবার তিনিই কংসের সভায় মৃত্যু রূপে, কুব্জার ঘরে কুব্জার মোহন রূপে। কি তাঁহার কর্ম্মজীবন! তিনি কখনও দ্বারকায়, কখনও ইন্দ্রপ্রস্থে, কখনও বা পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত বনে বনে, কখনও বিরাট রাজ্যে, কখনও হস্তিনায় পাণ্ডবের রাজ্য ভিক্ষার জন্য দূতরূপে। কখনও বিদুরের ঘরে খুদ গ্রহণকারী, কখনও বা জরাসন্ধের কারাগারে রাজগণের বন্ধন মুক্তিদাতা রূপে, কখনও সুভদ্রার অতিথি দণ্ডী রাজার জন্য পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধরত। আবার কুরুক্ষেত্রের রণে অর্জ্জুনের রথে তিনি সারথী, তিনিই আবার গীতার বক্তা। তাঁহার এই বিরাট্ বিশ্বরূপ দেখিয়া মদন স্তম্ভিত, মদন নিজেই মোহিত। এই পুরুষোত্তমজীবনলাভই হইল কামদমনের উপায়। এইরূপ ব্যাপক জীবন যাঁহারা যাপন করেন তাঁহাদের জীবনের চলার ছন্দ থাকে ঠিক। তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল হন না, অথচ তাঁহারা কোথাও একটা কিছুতে আট্‌কা পড়েন না। আট্‌কা পড়িলেই

জীবনের গতি হয় বন্ধ, ছন্দ যায় হারাইয়া। তখনই কাম মানুষকে বিপন্ন করে, উচ্ছৃঙ্খল সাজায়।

স্মৃতি—কামকে এতদিন রিপু এবং ঘৃণ্য বলায় মানুষের উহার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকিলেও উহা অনেকখানি দমিত থাকিত। কামের উপর হইতে চাপ সরাইয়া লইলে উহা কি সমাজ জীবনকে আরও উচ্ছৃঙ্খল করিবে না? এই সমস্যার ঠিক ঠিক সমাধান করিতে পারিতেছি না।

শ্রুতি—তুমি বলিতেছ পাপ ও ঘৃণ্য বলিয়া কামের উপর চাপ থাকায় কাম অনেকখানি দমিত থাকে, ইহা কি ঠিক কথা? যে জিনিষকে নিষেধ করা যায়, মানুষের ঝোঁক সেই জিনিষের উপরই পড়ে। নদীতে বাঁধ দিলেই, সেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য নদীর বেগ আরও বর্দ্ধিত হয়। বাড়ীর চারিটি ঘরের একটি ঘরে যাইতে নিষেধ করিলে সেই ঘরে যাইবার জন্যই কৌতূহল বেশী হয়, মন সর্ব্বদা সেই ঘরের তত্ত্ব জানিবার জন্য উক্ত ঘরের চিন্তায় পাগল হইয়া উঠে। সেইরূপ পাপের ভয় দেখাইয়া কাম হইতে মানুষকে দূরে রাখিবার চেষ্টায় মানুষ আজ কামের পথে দ্রুতগতিতে ধাবিত হইয়া অকালমৃত্যুর আশ্রয় লইতেছে। সমাজ উপর হইতে যতই কামকে চাপ দিয়াছে, কাম ভিতর হইতে সমাজ জীবনকে ততই ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে। যেমন বর্ত্তমানে গভর্ণ-মেণ্টের কণ্ট্রোল-ব্যবস্থা। মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনচলার পথে ব্যবহারিক জিনিষপত্রের উপর যতই আইনের চাপ পড়িতেছে, চোরা-বাজার ততই পুরাদমে বাড়িয়া চলিয়াছে। যে চাউলের দর ৩।৪ টাকা মণ ছিল, তাহা যখন সরকারী আইনে ১৬৲ টাকা মণ হইয়া রেশন কার্ডের মারফতে চলিতে আরম্ভ করিল, তখনই ২০৲।২৫৲।৪০৲ টাকায় যে যে-দরে পারিল চোরা বাজারে বিক্রী করিতে আরম্ভ করিল। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে যখনই বাধা আসিবে, তখনই সে গোপন পথে বিকৃত রূপে জীবনকে ধ্বংস করিবে,—বিজ্ঞানের নিকট এ সত্য আজ ধরা

পড়িয়াছে। কামের উপর হইতে "কাম পাপ নয়" বলিয়া চাপ সরাইয়া দিলে সমাজজীবনকে কাম আরও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া দিবে বলিতেছ। আপাততঃ বাহিরের দৃষ্টিতে সে রূপ মনে হইতে পারে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যারামের ভিতরকার বীজকে নষ্ট করিবার জন্যই ব্যারামের ভিতরের প্রকোপকে বাহিরে ফুটাইয়া তুলিয়া রোগীকে আরোগ্য করে। সেই রকম হয়তো বা "কাম পাপ নয়" বলিয়া কামের উপরের চাপ সরাইয়া দিলে, দুইচারি দিন ব্যাভিচারের মাত্রা বেশী হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান যেমন বলিতেছে, কাম জীবনচলার পথে অবশ্য-প্রয়োজনীয় এবং উহাকে চাপিয়া রাখিলে জীবনকে ভিতরে ভিতরে উহা ক্ষয়ই করিয়া দিবে, সেইরূপ এই কামকে কি ভাবে ব্যবহার করিলে মানুষের জীবন ও সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষিত হইবে সে বিজ্ঞানও বাহির হইবে। এতদিন পুরুষের প্রবৃত্তিকে দমিত রাখিবার চেষ্টায় পাপের ভয় দেখাইয়া ঋতুবতী স্ত্রীতে চারি দিন গমন করা নিষেধ ছিল। কিন্তু পাপের ভয় না দেখাইয়া বিজ্ঞানের সাহায্যেই উহার নিষেধ মানুষের জীবনে সহজ করিয়া আনিতে হইবে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উহা স্বাস্থ্যের দিক দিয়া উভয়েরই এবং বংশধারারও অনিষ্টকর—ইহা কি মানুষ মানিবে না? মানুষের জীবনে যদি বিশ্বরূপ জীবন এবং বিজ্ঞানের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলেই মানুষ সংযমী হইতে বাধ্য হইবে। বিজ্ঞানের দৃষ্টি লইয়া, সহজ স্বাভা-বিক জীবন লইয়া মানুষ যদি বিশ্বসেবায় জীবন অর্পণ করিয়া জীবনের পথে চলে, তাহা হইলেই সহজ, সংযত, জীবন্ত জীবন যাপন করিয়া মানুষ সার্থক হইতে পারিবে।

স্মৃতি—আচ্ছা, তুমি বলিতেছ নারীজীবনের বেদনা ও তাহার দূরীকরণের কথা—ইহার ভিতর দুর্ব্বোধ্য পাতঞ্জলের দার্শনিক তত্ত্ব তুলিয়া আমাদের আলোচনাকে জটিল করিয়া তুলিতেছ কেন? মেয়েরা এই দার্শনিক তত্ত্বের কি জানে? আর জীবন পথে চলিতে যাইয়া

এই তত্ত্বেরই বা কি প্রয়োজন আছে? সহজ সরল জীবনের প্রশ্ন তুলিয়া সহজ ভাবে মীমাংসা দিলে কি ভাল হইত না? আমার মনে হইতেছে মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনা যেন জটিল হইতেছে। মেয়েরা কি বর্ত্তমান যুগের হাওয়ার মধ্য দিয়া নিজেদের মর্য্যাদা নিজেরা বুঝিয়া লইতে পারিবে না? তাহাদের নিকট এই সমস্ত তত্ত্ব উপস্থিত করিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

শ্রুতি—বর্ত্তমান সমাজে নারীজীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মূল কোথায় তাহা না বলিলে নারীজীবনের বেদনার সম্বন্ধে আলোচনা হইবে কিরূপে? সমাজ গঠনের গোড়ায় শাস্ত্রের ভিতর দিয়াই তাহাদিগকে ছোট করিয়া রাখা হইয়াছে, সেইজন্যই দর্শন শাস্ত্রের জটিল প্রশ্ন না তুলিয়া উপায় নাই। মেয়েরা দার্শনিক তত্ত্বের কোনই খোঁজ রাখেনা—সেইজন্য এসকল কথা বুঝিতে তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে সত্য। কিন্তু তাহাদের জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে দর্শন শাস্ত্রের এই সত্যকে জটিল মনে হইলেও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহাদের বুঝিতেই হইবে। নারীজীবনের বেদনার উদ্ভব কোন্ স্থান হইতে, কেমন করিয়া সমাজে এই বেদনার মূল ভিত্তি শিকড় গাড়িয়াছে, গোড়ার সেই তত্ত্ব না বুঝিলে মীমাংসা দিবে কি করিয়া?

শাস্ত্রই তো নারীর পরাধীনতার গোড়ায় রহিয়াছে। কাজেই তাহাদের সামনে এই সমস্ত তত্ত্ব উপস্থিত করিবার প্রয়োজন আছে। শাস্ত্র গড়িয়া মনু বলিলেন—"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।" স্ত্রীলোকের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। স্বাতন্ত্র্য নাই বলিয়া তাহাকে বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন থাকিতে হইবে। তাই তো ১২ বৎসরের মধ্যেই বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, কেননা তাহার পরেই স্বাতন্ত্র্য লাভের বয়স্ আসে। এখানে নারীজাতির উপর শাস্ত্রের এক বাঁধন পড়িল। আবার ভীষ্ম বলিলেন—"স্ত্রিয়ঃ অনৃতম্

ইতি শ্রুতিঃ"। শ্রুতিরও মত যে স্ত্রীজাতি মিথ্যা। এই আর এক বাঁধনের ব্যবস্থা হইল। এই সব শাস্ত্রের কথা না তুলিলে কেমন করিয়া নারীজাতি বুঝিবে তাহাদের এ দশা, এ অধঃপতনের সূত্রপাত কোন স্থান হইতে, কবে হইয়াছে? মেয়েদের সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরও কত কি যে রহিয়াছে, তাহার সব আমি জানিওনা। বেতাল ভট্ট কৃত এক শ্লোক মেয়েদের একেবারে গৃহের জড় পদার্থের সামিল করিয়া দিয়াছে। এই সব কথা না বুঝিলে মেয়েদের চৈতন্য আসিবে কি করিয়া? কোন সময়ে মেয়েরা "পণ্য" রূপেও শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কোনও শাস্ত্রে মেয়েদের পণ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াই তাহাদের উৎসবে এবং জন-সমাগম স্থানে সজ্জিত করিয়া লইয়া দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করিবার কথা বলা হইয়াছে। মেয়েদের সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই বিচার ব্যবস্থা না তুলিলে মেয়েরা কেমন করিয়া বুঝিবে কতদিন হইতে কেমন করিয়া এই শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে? শাস্ত্রের ভাষা তুলিলে যদি আলোচনা জটিল হয় বল, তাহা হইলে আমি আর কি করিব? মনু আদি শাস্ত্রের মধ্য দিয়াই সমাজে নারীর যে কোন স্বাতন্ত্র্য নাই তাহা স্থাপন করিয়াছেন। সেইজন্যই আমাকেও শাস্ত্র তুলিয়াই উহার জবাব দিতে হইতেছে।

শাস্ত্র গড়িয়াছিলেন পুরুষেরা পুরুষকে প্রধান করিয়া; মেয়েদের প্রতি সুবিচার সেখানে হয় নাই। এই পথের খবর না জানিয়া যদি মেয়েরা অন্ধের মত পথ চলিতে যায়, পথ চলাই সার হইবে, দুই দিন পর আসিবে ক্লান্তি, আসিবে অবসাদ। তখন আবার পূর্ব্বের মতই অপমানের বোঝা মাথায় লইয়া ঘরে ঢুকিয়া ঘর করিতে হইবে, ঘরের বাহির হইবার কোন সার্থকতা হইবে না, প্রাণের বেদনাও যাইবে না। জীবনে তত্ত্বদৃষ্টি না থাকিলে জীবন সহজ হইবে কি করিয়া? তুমি যাহাকে সহজ জীবন বলিতেছ, উহা তো সহজ জীবন নয়; উহাই তো জটিল জীবন, অনেক সংস্কারের ভিতর দিয়া যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে।

ঐ পথে চলিতে যাইয়া জটিলতারই সৃষ্টি হইতেছে। মেয়েদের বর্ত্তমানের চলার ভঙ্গিতে পরিবারের ও সমাজের শৃঙ্খলা যে অচল হইয়া পড়িতেছে, এই চলাকে কি সহজ চলা বলিতে চাও? উহা সহজ চলা নয়, উহাই জটিল। এই জটিলতাকে সহজ করিবে যাহাকে তোমরা আজ জটিল মনে করিতেছ, সেই সহজ তত্ত্বজ্ঞান।

তুমি যে বলিলে তাহা সত্যই। বর্ত্তমান যুগের হাওয়ার ভিতর দিয়াই নারীজীবনের মর্য্যাদার প্রশ্ন আসিয়াছে, হাওয়ার ভিতর দিয়াই বিশেষ বিশেষ নারীজীবনের মাঝে কার্য্যকরীভাবে তাহার রূপও ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সামাজিকভাবে জনসাধারণকে এইভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে চিন্তাধারার গোড়ায় যে শাস্ত্রের বাঁধন রহিয়াছে, তাহাকে শাস্ত্রের ভিতর দিয়াই বদলাইয়া দিতে হইবে, শুধু হাওয়ার ভিতর দিয়া ইহার মীমাংসা হইবে না। এই হাওয়াকে দর্শনের ভিতর রূপ দিয়া নারীজীবনের সামনে ধরিতে হইবে। যেখানে তাহারা স্থির হইবে, তাহাই তো বলিতেছি। হাওয়া হাওয়াই থাকিয়া যায়, যদি সেই হাওয়াকে মানুষ জীবনে ধারণ করিয়া তত্ত্বের ভিতর দিয়া, শাস্ত্রের ভিতর দিয়া তাহার রূপ না দেয় এবং সেই রূপের চিত্র জনসাধারণের সামনে তুলিয়া না ধরে। দর্শনশাস্ত্রের ভিতর দিয়া না দিলে এই ভাবধারা জনসাধারণের ভিতর দেওয়া চলিবে না।

শাস্ত্রের ভিতর দিয়া কোনও কথা না বলিলে কি সমাজ তাহা লইতে পারে? এসেম্বলী হইতে আইন পাশ না হইলে কোন রাস্তার লোকের কথায় এমন কি মহাত্মা গান্ধীজী বলিলেও মানুষ লইতে পারে না, লয় না। সেই প্রকার শাস্ত্রের ভিতর দিয়া কোন কথা না দিলে সমাজ তাহা লয় না, লইতে পারে না। সমাজ ভিত্তির গোড়ায় যে দর্শনশাস্ত্র মেয়েদেরকে ছোট করিয়া রাখিয়াছে, সেই দর্শনশাস্ত্রের মূলে পুরুষ প্রকৃতির সমকক্ষতা স্থাপন করিয়া না লইয়া উপর হইতে সমকক্ষতা চাপাইয়া দিলে তাহাতে কোন স্থায়ী

কল্যাণ সাধিত হইবে না। এই কারণে বাধ্য হইয়া মেয়েদের দুর্ব্বোধ্য হইলেও দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছি।

বর্ত্তমান যুগে কতগুলি মেয়েকে এই কঠিন দর্শনশাস্ত্রকে জীবনে সহজ করিয়া লইতে হইবে এবং এই দর্শনের বার্ত্তা সঙ্গীত, সাহিত্য, কথকতা প্রভৃতির মধ্য দিয়া মেয়েদের ভিতর, সমাজের ভিতর ছড়াইয়া দিতে হইবে; নতুবা সমাজের কল্যাণ আনয়ন করা সম্ভব হইবে না। বর্ত্তমান যুগের রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র গণ-সাহিত্য ছড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই গণ-সাহিত্য সমাজের কাঠামোকে একটুকুও বদলাইতে পারে নাই ইহা নিশ্চিত জানিও। তাঁহাদের এই গণ-সাহিত্য সমাজের ইস্পাত কাঠামোতে আঘাত খাইয়া সমাজের বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িবে, সনাতন সমাজ আবার সেই সনাতনই থাকিয়া যাইবে। সেইজন্যই আজ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে গণ-দর্শনের, যাহা দ্বারা গণ-সাহিত্য সনাতন কাঠামোকে নবীনরূপে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। গণ-দর্শন ছাড়া গণ-সাহিত্য অচল, অবাস্তব, সাময়িক হুজুগমাত্র। পুরুষোত্তম-দর্শনই গণ-দর্শন। এই গণ-দর্শনই পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল বর্ত্তমান জগতে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

স্মৃতি—তুমি যে পাতঞ্জল দর্শনের দ্রষ্টা-দৃশ্যের কথা বলিয়াছ, উহার অর্থ আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও তো ভাই।

শ্রুতি—মুক্ত পুরুষের কাছে দ্রষ্টা পুরুষ অনাদি অনন্ত, দৃশ্যা প্রকৃতি অনাদি কিন্তু অনন্ত নহেন। প্রকৃতিকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করায় প্রকৃতি যে কবে হইতে কেমন করিয়া আছে তাহা জানা নাই কিন্তু আছে; এইরূপেই তাহার "অতীত" স্বীকৃত হইয়াছে। অতীত স্বীকার না করিয়া উপায় নাই; প্রকৃতি হইতেই যখন উদ্ভব তখন তাহাকে আর অস্বীকার করে কি করিয়া? বর্ত্তমান তো আছেই; তাহাকেও আর অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি অনন্ত নয়, জ্ঞান হইলে তাহার অন্ত আছে; একদিন তাহার শেষ হইবেই।

প্রকৃতি ঝঞ্ঝাটময়ী। আবেষ্টনই প্রকৃতি, ঘটনাই প্রকৃতি। সেইজন্য জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে প্রকৃতিকে মুছিয়া ফেলিয়া, সকল ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া সরল জীবন যাপন করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইজন্য প্রচলিত কৈবল্যতত্ত্বে প্রকৃতি নাই। প্রকৃতি যেখানে নাই, সৃষ্টিও সেখানে নাই। সৃষ্টি লোপের সাধনাই এদেশ লইয়াছে। তাই এদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। প্রকৃতির অনন্তত্ব স্বীকার করিলে, অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত পুরুষের সহিত অনন্ত প্রকৃতির যে অনন্ত বিশ্ব-সৃষ্টির লীলা চলিয়াছে তাহা মানুষের দৃষ্টির নিকট ধরা পড়িত।

ব্রজে এই জীবন্ত শাস্ত্রই প্রচারিত হইয়াছে। নিত্য নবীন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং নিত্য পরিবর্ত্তনশীলা, নিত্য নবীনা বিশ্ব-প্রকৃতির যুগল মিলনের ভিতর রহিয়াছে, "পুরুষও অনাদি অনন্ত, প্রকৃতিও অনাদি অনন্ত"।—এই দিব্যদর্শন সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগ-দেবতা সমন্বয়-ঘন পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন—"নির্ব্বিকল্প সমাধিও একটা ঘটনা, অতএব উহাও প্রকৃতি।" কোথায় যাইয়া পুরুষ প্রকৃতি-মুক্ত হইবে! প্রকৃতি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। ভারতবর্ষের ইষ্ট তাই রাধাকৃষ্ণ, ইষ্ট তাই শিবদূর্গা। পুরুষোত্তম জীবন-দর্শনে প্রকৃতির সহিত যুক্ত থাকিয়াই মানুষকে ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। আজ যেন ভাবিবার মত শক্তি মানুষের নাই, বিনা বিচারে সকলেই সব যেন মানিয়া চলিতেছে। কাহার ভিতর, কোন্ ঘটনার ভিতর কি তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া দেখিবার মত মনোবৃত্তি কাহারও নাই। ইহার অনেকটা কারণ অবশ্য দীর্ঘদিনের পরাধীনতা। বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সুযোগ সুবিধা তো নাই-ই, অবসরও নাই। দুটো অন্নবস্ত্রের জন্য করিতে হইতেছে হুড়াহুড়ি। কোথায় আমাদের দর্শন, কোথায় আমাদের বিজ্ঞান? জীবন আজ অন্ধকার।

স্মৃতি—আচ্ছা ভাই শ্রুতি, তুমি অতীতের উপর বর্ত্তমান গড়ে

বলিলে। অতীতের আদর্শ নারী তো সীতাও; তাঁহার মত সতী হইবার কথাই তো এতদিন শুনিয়াছি। আজ তুমি বলিতেছ আদর্শ নারী রাধারাণীর কথা। কেন, সীতা কি বর্ত্তমানের আদর্শ হইতে পারেন না? সীতা ও রাধা এই দুই নারীচরিত্রের সহিত বর্ত্তমান যুগের নারীদের কোথায় মিল বা অমিল, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

শ্রুতি—ভাই, এ প্রশ্নের জবাব তো তোমার নিজের মধ্যেই রহিয়াছে। তুমি তো ভাল মেয়ে, ভাল বৌ হইয়া অতীতের সীতা চরিত্রের অনুসরণ করিতে চাহিতেছ। কিন্তু তাহাতেই তৃপ্ত থাকিতে পারিতেছ না কেন? মন তোমার বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চায় কেন? তোমার নিজস্ব একটা গৌরবময় সত্তা আছে, যাহার সম্মান ও আস্বাদন না পাইয়া সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চায়। লক্ষ্মীমেয়ে, লক্ষ্মী-বৌ হইতেই মেয়েরা চায়, ইহা অতীতের সংস্কার। শ্রীরাধা তো সেরূপ লক্ষ্মী-বৌও ছিলেন না, লক্ষ্মী-মেয়েও ছিলেন না; তাঁহার ছিল কত দাবি; কিন্তু সে দাবি বর্ত্তমানের মেয়েদের মতও নয়। সে দাবির ভঙ্গিই ছিল আলাদা। কখনও কিছু না বলিয়া লক্ষ্মী-বৌ সাজিয়াই পুরুষের পিছনে নারীকে চলিতে হয়, কিন্তু উহাই তো তাহার জীবনের সবখানি কথা নয়। সীতাদেবী তো লক্ষ্মী-বৌ ছিলেন; তিনিই কি শেষ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী-বৌ থাকিতে পারিলেন? রাবণ জোর করিয়া সীতাকে লইয়া গিয়া রাক্ষসপুরীতে রাখিয়াছিলেন। সেই অপরাধে সীতাকে রামের নিকট বার বার অগ্নি পরীক্ষা দিয়া তবে তাহার সতীত্বের প্রমাণ দিতে হইল। কেন, রাম কি জানিতেন না যে সীতা রাম ছাড়া কিছু জানেন না? সেব্য যদি সেবকের হৃদয়ই না জানে, না বোঝে, সেরূপ হৃদয়হীন সেব্যের উপর সেবকের অভিমান দুর্জ্জয়। সীতা আত্ম-অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া তাই শেষে পাতালে প্রবেশ করিলেন। এ বিদ্রোহ কি সীতার রামের প্রতি

দুর্জ্জয় অভিমানেরই পরিচয় নয়? অভিমান হওয়াটা তো লক্ষী-বৌ হওয়ার পক্ষে একান্ত অন্তরায়, স্মৃতি। লক্ষী-বৌয়ের পক্ষে এ অভিমান পাপ।

স্মৃতি—ভাই, তুমি যে বলিলে সেব্য যদি সেবকের হৃদয় না বোঝে তাহার দুর্জ্জয় অভিমান হয় সেব্যের উপর। রাম কি বুঝিতেন না যে সীতা রাম ছাড়া কিছু জানেন না? কিন্তু কি করিবেন, তিনি যে রাজা, প্রজাদের তুষ্টি-সাধনের জন্য তিনি বাধ্য হইয়াই সীতার উপর এই অবিচার করিয়াছিলেন।

শ্রুতি—শ্রীরামের হৃদয় বুঝি স্মৃতি, তাঁহাকে হৃদয়হীন বলিতে প্রাণে বেদনাও লাগে, তবুও বিচার করিলে ঐ হৃদয়কে সমর্থন করা যায় না। তিনি ছিলেন রাজা, সে হিসাবে সীতাও তাঁহার রাজ্যের একজন নারী প্রজা, তদুপরি তিনি স্বামী—এই দুই দিক দিয়াই তো সীতা সুবিচার পাইতে পারেন। তিনি কি তাহা শ্রীরামের নিকট পাইয়াছিলেন? এখানে ছিল শ্রীরামচন্দ্রের স্বামিত্বের ও রাজপদের অভিমান। তিনি নিরপেক্ষভাবে হৃদয়ের দিকে তাকাইয়া বিচার করেন নাই। শ্রীরামচন্দ্র মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম, আর শ্রীকৃষ্ণ লীলা-পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাই প্রাণের দেবতা, প্রাণবল্লভ। এই প্রাণের ডাকে পাগল হইয়া ব্রজগোপীগণ ব্যবহারিক জগতের মান-সম্মান, কুলশীল সব যমুনার জলে ভাসাইয়া দিয়া এই মূর্ত্তিমান প্রাণের পূজায় প্রাণ জুড়াইয়াছিলেন। অতীত যুগের পুরুষোত্তম শ্রীরাম-চরিত্র ও সীতা চরিত্র সবখানি জীবনের মীমাংসা দিতে পারে নাই; সেইজন্যই তাঁহারা রূপ বদলাইয়া আসিয়াছেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধারূপে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা চরিত্রই যুগের সমস্যা সমাধানের আদর্শরূপে দাঁড়াইয়া; তাঁহাদের এখন সমাজ-জীবনে মিলাইয়া লইতে হইবে। যেখানে সীতা-প্রকৃতির পাতাল প্রবেশ, সেখান হইতেই বিপ্লবময়ী রাধা-প্রকৃতির উদ্ভব। এইখানে দাঁড়াইয়াই বর্ত্তমান নারী-জীবনের বিদ্রোহ।

স্মৃতি—আচ্ছা ভাই, রাধা প্রকৃতির সহিত বর্ত্তমান নারী প্রকৃতির সংযোগ কোথায়, কেমন করিয়া, তাহা বুঝাইয়া দাও না ?

শ্রুতি—শ্রীরাধা যেমন তাহার ক্লীবপতি রায়ানের নিকট জীবনের সর্ব্ব স্তরের খোরাক না পাইয়া বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বর্ত্তমান মেয়েরা পুরুষদের নিকট তাহাদের জীবনের সর্ব্ব স্তরের খোরাক পাইতেছে না বলিয়া তাহারাও বিদ্রোহ করিতেছে। এইস্থানে বর্ত্তমান মেয়েদের সহিত রাধা সমধর্ম্মী। মানুষের জীবনের পাঁচটী কোষ আছে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। এই পাঁচ স্থানের খোরাক পাইলে তবে সে তৃপ্ত থাকিতে পারে। প্রত্যেক মানুষের ভিতরই একটা পরিপূর্ণ জীবন লাভের খোঁচা রহিয়াছে। মানুষের অজ্ঞাতসারেও সেই খোঁচা তাহাকে পরিপূর্ণতার দিকে টানিয়া লইয়া যায়। বর্ত্তমান সমাজ অযোগ্যতায় পরিপূর্ণ ; অযোগ্যতাই তো ক্লীবত্ব। কোন-কিছু সৃষ্টি করিতে না পারাই ক্লীবত্ব। মানুষের আজ কোন কোষের খোরাক দিবার যোগ্যতা নাই। হয়ত কোন কোন স্থানে অন্নময় কোষের খোরাক পাওয়া যায়, কিন্তু মান পাওয়া যায় না। অন্ন এবং মান দুইটাই মানুষের জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহার উপর রহিয়াছে জ্ঞান-আনন্দের প্রশ্ন। দীর্ঘদিন নারীজীবনের এই কোষগুলি উপবাসী থাকায় আজ তাহারা করিতে চাহিতেছে বিদ্রোহ।

আমাদের দেশে যদি যোগ্য পিতা, যোগ্য স্বামী, যোগ্য গুরু, যোগ্য রাজা থাকিতেন, তাহা হইলে কি মানুষ এত বিভ্রান্তের মত রাস্তায় ছুটাছুটি করিত ? মেয়েরা আজ স্থানচ্যুত কেন ? নারী ঘরে পুরুষদের নিকট জীবনের মান সম্মান, জ্ঞান-আনন্দ পাইতেছে না। সেইজন্য তাহারা প্রাণের জ্বালায় ঘর ছাড়িয়া বাহিরে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের অধিকারের দাবি জানাইতেছে। পিতা যদি যোগ্য পিতা হইতেন, স্নেহময় পিতার কোল ছাড়িয়া, তাহার স্নেহের বাঁধন কাটিয়া, মেয়েরা স্বাধিকার লাভের জন্য বাহিরে আসিয়া হুড়াহুড়ি করিত না। স্বামী যদি যোগ্য স্বামী হইতেন, স্ত্রী স্বামীর

ভালবাসা ভুলিয়া বাহিরে ছুটাছুটি করিত না। গুরু যদি যোগ্য গুরু হইতেন, শিষ্য কুল-গুরু ছাড়িয়া জ্ঞানের পিপাসায় বাহিরের গুরুর পিছনে পিছনে ছুটিয়া লাঞ্ছিত হইত না। রাজা যদি যোগ্য রাজা হইতেন, প্রজারা রক্তাক্ত পথ বাছিয়া লইত না।

ব্রহ্মময়ী রাধারাণী ব্রজে ক্লীব রায়ানের অযোগ্যতায় তিক্ত হইয়া, বেদনাতুর হইয়া নিজ জীবনের ব্যর্থতাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্যই ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বাহিরে আসিয়া পরমব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে জীবন সমর্পণ করিয়া সার্থক প্রকৃতি, পরাপ্রকৃতি-রূপে বিশ্বের নিকট আরাধ্য হইয়াছিলেন। সেইরূপ বর্ত্তমান নারী-প্রগতির মূলেও পুরুষের অযোগ্যতা এবং শোষণে নারীর পুঞ্জীভূত বেদনার ইতিহাসই রহিয়াছে। শ্রীরাধার ঘর ছাড়ার মূলেও যে বেদনা, যে অপমান ছিল, বর্ত্তমান নারী-প্রগতির মূলেও রহিয়াছে সেই অপমান, সেই বেদনার কাহিনী। এইস্থানে রাধা-প্রকৃতির সহিত বর্ত্তমান নারী-প্রগতির ঐক্য।

স্মৃতি—আচ্ছা শ্রুতি, তুমি যে পঞ্চ কোষের কথা বলিলে, উহার কোন্ কোন্ স্তরে মানুষের কিরূপ অবস্থা হয় খুলিয়া বল; তোমার কথা শুনিয়া কত প্রশ্নই মনে উঠিতেছে।

শ্রুতি—বড় হইবার একটা স্বতঃসিদ্ধ খোঁচা মানুষের জীবনে রহিয়াছে। এই খোঁচা ছাড়া মানুষ নাই। প্রেমই হইতেছে মানুষের স্বরূপ; শ্রীভগবান প্রেমঘন। এই স্বরূপকে পাইবার পথে, ভগবানকে পাইবার পথে, জীবনকে পাইবার পথে মানুষ ছুটিয়াছে অনন্তকাল। এই ছোটার পথে মানুষকে পাঁচটী স্তরের সমন্বয় করিতে হয়। অর্থাৎ পাঁচটী স্তরই যখন হাত ধরাধরি করিয়া জীবনের মাঝে দাঁড়ায়, তখনই মানুষ তাহার স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম অন্নের স্তর। সাধারণ দৃষ্টিতে অন্ন যাহার প্রচুর আছে সে-ই বড় লোক। কিন্তু শুধু অন্নের স্তরে বড় হইলেই মানুষ বড় নয়, যদি না সে

প্রাণের স্তরে বড় হয়। শুধু অন্ন আছে, প্রাণ নাই, সে অন্ন বিশ্বের বা সমাজের কাহারও কোন কাজেই লাগে না। যাহা শুধু একার ভোগের জন্য, তাহা কাহাকেও কোন দিন আনন্দ দেয় না, কল্যাণও আনে না। দেখিতেই তো পাইলে দেশের দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া মরিল, আর একদল সেই অন্ন বেচিয়াই প্রচুর টাকা করিল। তাহাদের যদি প্রাণ থাকিত, দেশের সেবায় সব দিয়া সেবার নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিত; দেশও বাঁচিয়া যাইত। অন্নের ক্ষেত্রে প্রাণ আসিলে সেই অন্ন আর মানুষ একা ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না, সে তখন তাহার পরিবার, তাহার সমাজ, তাহার জাতির কথা ভাবিতে থাকে। প্রাণের স্পর্শে অন্নের ক্ষেত্র তখনই হয় বড়।

আবার এই অন্ন ও প্রাণের স্তরেও মানুষের বড় হইবার সাধ মেটে না, প্রাণের স্তরকে যদি মন আসিয়া আলিঙ্গন না করে। প্রাণ শুধু তাহার পরিবার, সমাজ ও জাতি লইয়াই ছিল; মনের স্তর যখন আসিয়া প্রাণের স্তরের গলা ধরিল, সে তখন বিশ্ব-মানবের ভাবনা ভাবিতে আরম্ভ করিল। কেননা মনের দৃষ্টি আরও ব্যাপক। কেমন করিয়া বিশ্বের মান, বিশ্বের গৌরব রক্ষিত হয়, সে তখন সেই চিন্তায়ই পাগল। তাহাতেও সে তৃপ্ত হইতে পারিবে না, যদি এই মনের স্তরে বিজ্ঞান আসিয়া অবতরণ না করে। বিজ্ঞান যখন মনের আকুলি ব্যাকুলিতে আসিয়া মনের গলা ধরিল, তখন বিশ্বের সকল প্রাণীসমূহকে, সকল উদ্ভিদসমূহকে সে নিজের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই চেতনা যখনই মানুষের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেয় তখন সে আনন্দ রসে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তাহার দৃষ্টিতে তখন সমস্ত বিশ্ব, বিশ্বের সমস্ত ধূলিকণা আনন্দঘন ভগবানের প্রকাশ বলিয়া স্ফুরিত হয়, হৃদয় তখন ভগবৎপ্রেমে পাগল হইয়া যায়। ধূলিতে প্রেমই আনন্দময় কোষের স্বরূপ। তখনই মানুষের জীবনের

সবটুকু "আনন্দময় আমি আছি—" এই বাণী স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে গাহিয়া উঠে।

এই বড় হওয়ার, এই "আমি আছি"র খোঁচাতেই আজ ভারতবর্ষের মেয়েরা ঘরের বাহির হইয়াছে। এই খোঁচাই ভারতের আকাশে বাতাসে ঘুরিতেছে, ইহা যে ভারতেরই সম্পদ। ঐ "আমি আছি"র খোঁচাতেই একদিন ব্রজগোপীগণ ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে জীবন বিলাইয়া, পুরুষোত্তমজীবন পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঘর ছাড়া মেয়েদিগকে এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণজীবনের খোঁজ করিতে হইবে। যাঁহার ডাকে তাহারা ঘর ছাড়িয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই জীবনে পাইবার জন্য ব্যাকুল হওয়া প্রয়োজন। যদি তাহারা পুরুষোত্তমজীবন পায় তবেই তাহাদের জীবন সমর্পণ করা সার্থক হইবে, জীবন ধন্য হইবে। যেখানে সেখানে কাপুরুষের কাছে জীবন বিলাইয়া নিজকে অপমানিত হইতে না দেওয়ার জন্য তাহাদের দৃঢ়পণ করা উচিত।

বিনা সাধনায় কেহ কাহাকেও কোন দিন পায় নাই। শিব দুর্গাকে পাইয়াছিলেন বিশ্বরূপের সাধনা করিয়া, দুর্গা শিবকে পাইয়াছিলেন বিশ্বরূপের সাধনা করিয়া, তাই তাঁহারা আদর্শরূপে বিশ্বের পিতা এবং বিশ্বের মাতা বলিয়া পূজিত। প্রেমঘন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণী উভয়েই উভয়কে ভজনা করিয়া তবে পাইয়াছিলেন। বিশ্ব তাই তাঁহাদিগকে ইষ্টরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে। এই বিশ্বসৃষ্টির মূলেও রহিয়াছে ব্রহ্মার তপস্যা। পাইতে হইলে সাধনা করিতেই হইবে। বিনা সাধনায় পথে ঘাটে যেখানে সেখানে পুরুষ নারীকে পাইবে না, নারীও পুরুষকে পাইবে না; পাওয়া কি এতই সহজ? আজ পাইতেছে না কেহই কাহাকেও। পাইতে হইলে সাধনা করিতেই হইবে, যোগ্য হইতেই হইবে, নারীকে নারায়ণী হইতে হইবে, নরকেও নারায়ণ হইতে হইবে; তবেই হইবে সত্য বাস্তব পাওয়া।

স্মৃতি—ঘর ছাড়া ও সমাজ ছাড়া ব্রজের এ আদর্শ তুমি সমাজে কি করিয়া দিবে? আমি তো ইহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

শ্রুতি—এ প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে বলিতেছি। একটা সমগ্র জীবনের তত্ত্ব বলিতে যাইয়া অনেক ঘটনা তুলিতে হইতেছে। আমি ক্রমে তোমার ঐ প্রশ্নে আসিব। নারী জাতি ঘর করিতে আরম্ভ করিয়াছিল পুরুষকে অবলম্বন করিয়া; সেই পুরুষ যদি ঠিক থাকিত, পুরুষোত্তম হইত তবে তাহাকে ধরিয়া মেয়েরা সার্থক হইত। ঘরে যদি মেয়েরা জীবনের সার্থকতা লাভ করিত তবে কি আর তাহারা ঘর ছাড়ে? ঘর ছাড়ার তো ভাই অনন্ত বিপদ দেখিতেই পাইতেছ। ঘর ছাড়ার এই বিপদের জন্যই মেয়েরা এতদিন শত লাঞ্ছনা অত্যাচার সহ্য করিয়াও ঘরে থাকিত। যাহারা সহ্য করিতে না পারিত তাহারা আত্মহত্যা করিত। আজ সহিবার সীমাও যেমন অতিক্রম করিয়াছে, তেমনি বাহির হইবার জন্য বাহির হইতেও কালের মধ্য দিয়া একটা টান আসিয়াছে, সুযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। এইজন্য তাহারা ঘর ছাড়িয়া বাহিরে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাহির তো তাহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত ক্ষেত্র; বাহিরে যে কাড়াকাড়ি চলিয়াছে তাহার ভিতর তাল সামলাইয়া চলিবার মত বুদ্ধি কি বর্ত্তমান মেয়েদের আছে! এই কাড়াকাড়ি হইতে নিজকে রক্ষা করা কি তাহাদের পক্ষে সম্ভব, যদি না রাধারাণীর মত বাহিরে আসিয়া কোন উত্তম-পুরুষ পুরুষোত্তমকে তাহারা না পায়? তাহাদের তখন ঘাটে ঘাটে দুর্গতির অবধি থাকিবে না; বর্ত্তমানে হইতেছেও তাহাই।

স্মৃতি—সত্যি ভাই, মেয়েদের ঘর ছাড়িয়া বাহিরে বাহির হইবার বিপদ অনেক, কিন্তু ইহা জানিয়াও তো তাহারা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। এমন করিয়া এতদিনের ঘরের বাঁধন মেয়েদের আল্‌গা হইয়া গেল কেন?

শ্রুতি—আমাদের সমাজ কি ভাবে গড়া এবং কোথা হইতে সংসারের ভাঙ্গন ধরিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমাজ পুরুষ-প্রধান হওয়ার ফলে সর্ব্ববিধ চাপ মেয়েদের উপর যাইয়া পড়িল, মেয়েদের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য-বোধ স্ফুরিত হইবার পথে একান্ত বাধার সৃষ্টি হইল। স্বাতন্ত্র্য-বোধ জাগ্রত হইতে না পারার ফলে মেয়েরা গেল শুকাইয়া। নারীজাতি শুকাইয়া যাওয়ার জন্যই জীবন্ত পরিবার আর গঠিত হইতেছে না। ব্রজে রাধা-রাণীর অবতরণই নারীর প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাই আজ যে মেয়েদের মধ্যে কালের ধর্ম্মে স্বয়ংমূল্যবোধ জাগ্রত হইয়াছে, তাহার অর্থই আমরা ব্রজের রাধারাণীর চিত্রে পাইব। মেয়েদের এই বর্ত্তমান জাগৃতির ফলে আজ চারি জাতীয় নারীর সৃষ্টি হইয়াছে।

স্মৃতি—এই চারি জাতীয় মেয়েদের লক্ষণ কি? তাহারা কি সবাই ঘর ছাড়া?

শ্রুতি—সমাজে পাঁচ স্তরের মেয়ে রহিয়াছে। একদল মেয়ে আছে, সমাজ যতই কেন না অত্যাচারী হউক, হাসিমুখে তাহারা সেই অত্যাচারকে সহ্য করিয়া যাওয়াটাকেই সতীত্ব বলিয়া, গৌরব বলিয়া মনে করে। ইহারা ঘর ছাড়ার কল্পনাও করে না। অপর একদল মেয়ে অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ মনে মনে করে, কিন্তু মুখে কিছু বলিবার সাহস তাহাদের নাই। তাহাদের বেদনা তাহাদের প্রাণকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিলেও তাহারা কোনও প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যায়। আবার কখনও কখনও তাহাদের বিদ্রোহ সংসার-জীবনকে বিষাক্ত করিয়াও তোলে। তৃতীয় দল স্বামীর পরিবারের কাহারও সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া, স্বামীকে তাহার আত্মীয় স্বজনের সকল সম্পর্ক হইতে কাড়িয়া লইয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়ে। সংসার-জীবন যাপন সম্বন্ধে তিক্ত ধারণা লইয়া আর একদল সংসার একেবারে করিবে না স্থির করিয়া লইয়া ঘরের বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। অপর

একদল সমাজ হইতে বাহির হইয়া গিয়া বারনারী-জীবন যাপন করে। এই পাঁচ দলের প্রথমদল একেবারে অতীতের শক্ত খুঁটায় বদ্ধ, তাহাদের ভিতর এখনও বর্ত্তমান বিশ্বের বিপ্লবের সাড়া পৌঁছে নাই। অপর চার দলই ঘর ছাড়া, ইহাদের সকলের আদর্শই রাধা-চরিত্র। মেয়েদের স্বাভাবিক গতি হইল নিজকে একস্থানে নিঃশেষে ডুবাইয়া দেওয়া; তাহারা ডুবিবার জন্য ব্যাকুল। রাস্তায় বাহির হইল বলিয়া প্রকৃতি তো বদলাইল না। কিন্তু ডুবিবে কোথায়? সমুদ্র ব্যতীত তো ডোবা যায় না? ডোবার জলে কি ডুবিয়া মরা যায়? না সে মরায় কোন সার্থকতাই আছে? মানুষ মরিতে চায় না, মরিয়া বাঁচিতে চায়। এই মরিয়া বাঁচিবার কৌশল নারীকে শিখিতে হইবে। নতুবা কাপুরুষ লইয়া জলে ডুবিয়া মরিবার ইতিহাসই বাড়িয়া চলিবে।

স্মৃতি—তোমার কথা শুনিয়া মন বেদনায় ভরিয়া উঠিতেছে। ঘর ছাড়া মেয়েরা তবে কোথায় ডুবিবে? সমুদ্র তাহারা কোথায় পাইবে?

শ্রুতি—মেয়েরা কোথায় ডুবিবে বলিতেছ কেন? তাহারা কাহার ডাকে ঘরের বাহির হইল? যে আত্মার অবমাননায়, যে প্রাণের তাড়নায়, যে আদর্শের খোঁচায় তাহারা ঘরের বাহির হইয়াছে, তাহাদের ডুবিতে হইবে, স্থিত হইতে হইবে সেইখানেই। নিজ নিজ আত্মকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া স্ব-জ্যোতিতে নিজ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জীবনকে বাড়াইয়া তুলিতে হইবে, তবেই না হইবে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া বিপ্লব করার সার্থকতা? নারীসমাজ যেদিন আদর্শে স্থিত হইয়া তাহার জীবনকে বাড়াইয়া তুলিবে, সেইদিন তাহার বর্দ্ধিত জীবনের চাপে পুরুষ ফাঁপরে পড়িবে। বাধ্য হইয়া পুরুষকে তখন কাপুরুষত্ব পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম হইবার পথে রওনা দিতে হইবে। মেয়েদের আপনার মাঝে আপনি গড়িয়া উঠিবার ধাক্কায় স্বাধিকার-প্রমত্ত পুরুষ-প্রধান সমাজ-দণ্ড খসিয়া পড়িবে। বর্ত্তমানে মেয়েরা যে অভিযান করিয়াছে

ইহা তো বিপ্লব নহে, ইহা হইল বিদ্রোহ। ইহাতে সমাজ গড়িবে না, ধ্বংসই হইবে। বিপ্লবের ভিতর রহিয়াছে গঠন ; এই বিপ্লবের আদর্শই রাধারাণী।

স্মৃতি—তুমি বলিলে বর্ত্তমানে মেয়েরা যে অভিযান করিয়াছে ইহা বিপ্লব নহে, বিদ্রোহ। বিপ্লব ও বিদ্রোহের পার্থক্য কি বুঝাইয়া বল না ভাই ?

শ্রুতি—বিপ্লবের ভিতর থাকে প্রেম, থাকে একটা গঠনাত্মক ভাব। বিদ্রোহের মূলে থাকে প্রতিহিংসা, ধ্বংস করিবার মনোবৃত্তি। বর্ত্তমান নারী-প্রগতি বিদ্রোহাত্মক। সেইজন্য তাহারা জীবনের দিক দিয়া বাড়িতে পারিতেছে না, করিতেছে কেবল সমাজ জীবন, পরিবার জীবনকে ধ্বংসই। বিদ্রোহ সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতার অভিব্যক্তি। বিপ্লবের রূপ বিরাট, বিশ্বজনীন। বিশ্বের বেদনাকে নিজের ভিতর জমাইয়া তুলিয়া বিশ্বকে গড়িয়া তুলিবার জন্য বিশ্বের সামনে যে ঘোষণা, তাহাই বিপ্লব। ঐতিহাসিক রাধারাণী মূর্ত্তিমতী বিপ্লব। তাঁহার বিপ্লব সমস্ত অত্যাচারিতা লাঞ্ছিতা প্রকৃতিরই বিপ্লব, সকলের পক্ষ হইয়া সকলের বেদনাকে নিজের বুকে ঘনীভূত করিয়া সকলকে গড়িবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা। সেইজন্যই তাঁহার বিপ্লবে গড়িয়া উঠিয়াছিল গোপীসংঘ। "গুহ্যতম কান্নাকে বিশ্বজনীন করিয়া তোলার নামই বিপ্লব।" বিপ্লবের ভিতর একটা গঠন থাকিবেই। ধর্ম্মগ্লানির বেদনায়, বেদনার বিগ্রহ মহাপ্রভু করিলেন বিপ্লব ; তাঁহার সেই বিপ্লবে গড়িয়া উঠিল বৈষ্ণব সম্প্রদায়। সাবিত্রীর বিপ্লবে যমরাজ স্তম্ভিত হইয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহার মৃত স্বামীকে। বেহুলার বিপ্লব কি ভীষণ, কি কষ্টসাধ্য, কি দৃঢ়তাব্যঞ্জক, যে বিপ্লবে বাঁচাইয়া আনিল মৃত গলিত স্বীয় পতিকে ! ইহাই হইল বিপ্লবের সার্থক রূপ। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, বর্ত্তমান নারী-প্রগতি বিপ্লব নহে, বিদ্রোহ।

স্মৃতি—আচ্ছা, তুমি বলিলে রাধারাণীর বিপ্লব গঠনমূলক ; ইহার অর্থ বুঝিলাম না ; রাধাচরিত্রে কি কর্ম্মধারা প্রবর্ত্তিত বা গঠিত হইয়াছিল ?

শ্রুতি—কি আশ্চর্য্য স্মৃতি! তুমি রাধার বিপ্লবের ভিতর কি গঠনকৌশল ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই বুঝিতে পারিতেছ না? বর্ত্তমান যুগে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় যে সংঘ রচনা, তাহাই তাঁহার জীবনে তাঁহার বিপ্লবের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সংঘের মধ্য দিয়াই সে দিন গোপীকুল সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নবীন জীবনের খোঁজ আনিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরাধার সেই সংঘ গঠনের ভিতর যে তত্ত্ব বা আদর্শ লুকাইয়াছিল, তাহাই আজ যুগধর্ম্মে বাস্তবের ক্ষেত্রে রূপ লইবার জন্য ভারতের বুকে আগত। ভারতের সর্ব্ব সমস্যার সমাধানের মূলে রহিয়াছে এই সংঘ গঠন।

স্মৃতি—ভারতের সমস্যা সমাধান করিবার জন্য সংঘ গড়িবার এমন কি প্রয়োজন রহিয়াছে, আর সেই সংঘই বা আজ মানুষ গড়িতে পারিতেছে না কেন?

শ্রুতি—সংঘব্যতীত কোন জগৎ-হিতকর কার্য্যই হয় না; সংঘ-শক্তিই জগতের কল্যাণ আনয়ন করে। আজ যে ভারতবর্ষের এ দুর্দ্দশা, তাহার কারণ তাহার বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি। প্রকৃতির ক্ষেত্রই খণ্ডের ক্ষেত্র। খণ্ডের একটি স্বাভাবিক প্রকৃতি এক খণ্ডের অপর খণ্ডের সহিত লড়াই করা। এ দেশের শাস্ত্র সেইজন্য খণ্ডের ঝগড়াকে এড়াইবার জন্য দ্বন্দ্বাতীত অখণ্ডের কথা বলে। সংঘ যে গড়িতেছে না, তাহার মূলে রহিয়াছে এই খণ্ড-অখণ্ডের ঝগড়া। ছোট বেলা একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। একটী মেয়েকে বিবাহের জন্য বরের বাড়ী হইতে দেখিতে লোক আসিয়াছে। পাশের ঘরে উক্ত লোকটী থাকায় অপর ঘরে হামান-দিস্তায় চাল গুঁড়া করিতে বসিয়া মেয়েটী খুব অসুবিধা বোধ করিতেছিল; কেননা তাহার হাতের কাঁচের চুড়িগুলি কেবলই শব্দ করিতেছিল। ইহাতে তাহার লজ্জা হইতেছিল। সে তখন একে একে হাতের কাঁচের চুড়িগুলি ভাঙ্গিতে আরম্ভ

করিল ; যখন মাত্র এক গাছা চুড়ি অবশিষ্ট থাকিল, তখন আর কোনও শব্দ হইল না। ইহা দ্বারা মেয়েটীর এই জ্ঞান হইল যে, বহু হইলেই যত গণ্ডগোল। বিবাহ করিলেই এক হইতে দুই, দুই হইতে বহু হইবে—অতএব আমি আর বিবাহ করিয়া ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করিব না ; আমি একাই থাকিব। ইহাই হইল অতীত সমাজের চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারার ফলে খণ্ড-প্রকৃতি পড়িল বাদ ; একান্ত অখণ্ডের, একের পূজা করিতে যাইয়া ভারতবর্ষ আজ বিচ্ছিন্ন ভারতে পরিণত। যে ঝঞ্ঝাটময়ী খণ্ড-প্রকৃতি অস্বীকৃত হইয়াছিল, আজ তাহারই জয়গানে সর্ব্বত্র মুখরিত ; অখণ্ড ব্রহ্মই আজ বাদ পড়িয়া যাইতেছেন। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। এখন এই বিচ্ছিন্ন ভারতকে সংঘবদ্ধ করিতে হইলে প্রয়োজন খণ্ড-অখণ্ড সমন্বয়ের চিন্তাধারা ও দর্শনের স্থাপনা। তবেই গড়িয়া উঠিবে সংঘ।

পাবনা জেলা জেলা হিসাবে এক, গ্রাম হিসাবে বহু। পাবনা যদি বলে—বহু গ্রাম বাদ দিয়া আমি এক পাবনাই থাকিব, পাবনা তখন শূন্যে পরিণত হইবে। তখন আর জেলার ব্যাপকত্ব, অখণ্ডত্ব কিছুই থাকে না। বাস্তবিক পক্ষে তো সকল গ্রামের সমষ্টিই জেলা। সকল গ্রামবাসীই যখন বলে—"আমি পাবনা জেলার লোক", তখন ইহা নিশ্চিত সত্য যে, প্রত্যেক গ্রামের বুকেই অখণ্ড পাবনা জেলা রহিয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডই স্বয়ং পূর্ণ। প্রত্যেক খণ্ডই নিজের মাঝে এক হিসাবে পূর্ণ; কিন্তু যেহেতু জেলার পরিচয় দিতে হইলে গ্রামের প্রয়োজন হয় না, অথচ গ্রামবাসীর পরিচয় দিতে হইলে জেলার প্রয়োজন হয়, সেইজন্য সেইখানে প্রতি খণ্ড-গ্রামের অন্তরে একটি অপূর্ণতাও রহিয়াছে এবং সেই অপূর্ণতার সুযোগ লইয়াই জেলা গ্রামকে অস্বীকার করে। খণ্ড-গ্রামের এই অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় ভরিয়া তুলিবার জন্যই সকল খণ্ড গ্রামের হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। স্বয়ংপূর্ণ গ্রামগুলি যখন হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়ায়, তখনই সেই অন্যোন্য-

বদ্ধবাহু গ্রামগুলিই জেলায় পরিণত হয়। একটী খণ্ড-গ্রাম যদি অপর খণ্ড-গ্রামগুলির সহিত সম্পর্ক না রাখে, তখন সেই ক্ষুদ্র খণ্ড-গ্রামের উপর অখণ্ড জেলার অত্যাচার চলিতে পারে, কেন না জেলা তখন গ্রাম হইতে অনেক বড়। এই ছোট-বড়র শোষণ নীতিতে সমাজ গড়া। স্বয়ংপূর্ণ খণ্ড-গ্রামগুলি যখনই পরস্পর পরস্পরের সহিত সংঘবদ্ধ হইল, অখণ্ড জেলা তখনই তাহার সমকক্ষ। খণ্ডসমষ্টি ও অখণ্ডের এই সমকক্ষতার কথাই রহিয়াছে পুরুষোত্তমদর্শনে। কেহ কাহাকেও অস্বীকার করিয়া দীর্ঘদিন চলিতে পারিবে না। উভয় উভয়কে স্বীকার করিলেই হইবে উভয়ের সত্যতার প্রতিষ্ঠা। তখনই ফিরিয়া আসিবে বিচ্ছিন্ন ভারতের কল্যাণ। খণ্ড-অখণ্ডের এই মিলনকৌশল শিখাইতেই ব্রজে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা।

স্মৃতি—তুমি বলিলে খণ্ডের একটি ধর্ম্ম অপর খণ্ডের সহিত লড়াই করা ; তবে আর এক খণ্ড অপর খণ্ডের হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইবে কি করিয়া ?

শ্রুতি—খণ্ডসমূহের এই মিলন-তত্ত্বই ব্রজলীলার ভিতর রহিয়াছে। গোপীদের আত্মা, গোপীদের স্বরূপ, গোপীদের আদর্শ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। যেদিন সমাজের নিপীড়নে গোপীগণ নিপীড়িত, সেইদিন তাঁহাদের আদর্শ বাহিরে রূপ ধারণ করিয়া বাহির হইতে ডাক দিল ; তখন সেই ডাকে ব্রজগোপীগণ যে যাহার মত নিজেদের ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। একের অপরের খবর লইবার অবসর পর্য্যন্ত ছিল না। পথে বাহির হইয়া যখন শুনিতে পাইলেন যে, সকলে একই আদর্শের টানে ঘরছাড়া, তখন তাঁহারা সবাই একই বেদনার সূত্রে, শ্রীরাধাসূত্রে গ্রথিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিলেন। সকলের সব বেদনার ঘণীভূত মূর্ত্তিই বেদনাময়ী পরাপ্রকৃতি শ্রীরাধা। সকল ব্রজগোপীর অখণ্ড আত্মস্বরূপ, মূর্ত্তিমান আদর্শ যে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আসিয়া তখন সেই মূর্ত্তিমতী বেদনার নিকট

ধরা দিলেন। সকল খণ্ড প্রকৃতি এ উহার হাত ধরিয়া সেই বিরাট অখণ্ড সত্তার ভিতর আত্মসমর্পণ করিয়া নিজ নিজ স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। পুরুষোত্তমের আদরে পুঞ্জীভূত অনাদরের জ্বালা জুড়াইল। এই খণ্ড-অখণ্ডের মিলনই ব্রজে রাসলীলা। প্রতি দুইটি খণ্ড গোপীর মাঝে অখণ্ড কৃষ্ণ বিরাজমান থাকিয়াই রাসনৃত্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই খণ্ড প্রকৃতির গলা ধরিয়া অখণ্ড ব্রহ্মের নৃত্যের ভিতর হইতেছে বিশ্বের বিরাট সংগঠনতত্ত্ব স্ফুরিত। অখণ্ড আদর্শরূপী পুরুষের ভিতরেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সংঘ গড়িয়া উঠা সম্ভব। জীবন্ত মূর্ত্ত অখণ্ড আদর্শের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন খণ্ড প্রকৃতি পরস্পরের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া মিলিতে পারে। খণ্ডের জীবনে জীবন্ত আদর্শবোধ জাগ্রত হইলেই খণ্ডের সংঘ গড়িয়া উঠে; খণ্ডের সংঘ গড়িলেই অখণ্ড সেখানে ধরা পড়ে। এই খণ্ড-অখণ্ডের মিলনেই বিশ্ব স্বস্থ হইতে পারে।

স্মৃতি—আচ্ছা ভাই, তুমি যে পুরুষোত্তমের কথা বলিতেছ, এই পুরুষোত্তম কাহাকে বলে? পুরুষোত্তমের লক্ষণ কি?

শ্রুতি—যিনি একাধারে বিস্তীর্ণ ও গভীর, তিনিই ভগবান। সাধারণতঃ দেখা যায় যাহা স্বভাবতঃ বিস্তীর্ণ, তাহা গভীর নয়; আবার যাহা গভীর, তাহা বিস্তীর্ণ নয়। স্বরূপে ভগবান গভীর, বিশ্বরূপে তিনি বিস্তীর্ণ। এই স্বরূপ-বিশ্বরূপ সমন্বয় করিয়া যখন ভগবান মানুষী তনু ধারণ করিয়া ঐতিহাসিক রূপে বিশ্বের বুকে দাঁড়ান, তখন তিনিই পুরুষোত্তম নামে প্রথিত হন। এই পুরুষোত্তমই শ্রীকৃষ্ণ। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই ভগবান। পুরুষোত্তম নিত্য নূতন। রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী নাটকে এই আদিকালের বুড়োর নিত্য নূতন হওয়ার কথাই রহিয়াছে। যুবকের দল যখন ছুটিল সেই আদিকালের বুড়োর সন্ধানে, তিনি তখন গুহার ভিতর হইতে বাহির হইলেন নবীন রূপে। তিনি যুগে যুগে নিত্য নবীন রূপে আসেন।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাই নিত্য নবীন মদন; এই কামনা-বহুল বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তিনি নিত্য নূতনরূপে সকলের দাবী পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনিই মাত্র বলিতে পারেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"—। যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমিও তাহাকে সেই ভাবে ভজনা করি। ঐতিহাসিক সত্যরূপে কি বিশ্বরূপ জীবন ছিল তাঁহার! একজন মানুষ হইয়া তিনি সকলের দাবী পূরণ করিয়াছিলেন অথচ কোথাও ধরা পড়েন নাই। সকলের হইয়াও তিনি ছিলেন সকলের অধররূপে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তো আর কেহ হইতে পারিবে না। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভাবাপন্ন অনেক ভক্ত মহাপুরুষ আছেন তাহাদিগকেও ভগবান বলা হয়। মুনি ঋষিদিগকেও ভগবান বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে, তাহা তো জান? তাই বলিয়া তাঁহারা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান নহেন। আলো সূর্য্যের, তাপ সূর্য্যের; কিন্তু সূর্য্যের রশ্মি সেই তাপ ও আলো বহন করিয়া আনিয়া জগৎকে আলোকিত করে, তাপিত করে। তেমনি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও তত্ত্ব পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেরই; ভক্তজীবন তাহার মাঝে অবগাহন করিয়া, সেই ভাবে ভাবিত হইয়া জগতের বুকে সেই ভাবধারাকে বহন করিয়া আনে। অনুমান ও প্রত্যক্ষ-সমন্বিত জীবন যাঁহার, তিনিই পুরুষোত্তম মানুষ এবং তিনিই প্রকৃত গুরু হইবার অধিকারী।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে কেহ তো এখন এই বিশ্বে প্রকটরূপে পাইবেন না; এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন যাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ, এমন মানুষই বর্ত্তমান যুগের সমস্যা সমাধানের যোগ্য। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাঁহার যোগ রহিয়াছে এবং ঐ যোগ থাকার দরুণ যাঁহার জীবনে স্বরূপ-বিশ্বরূপ সমন্বয় করিবার যোগ্যতা লাভ হইয়াছে, তিনিই বর্ত্তমান যুগসমস্যার সম্মুখে দাঁড়াইতে সমর্থ। প্রত্যেক মানুষেরই পুরুষোত্তম হইবার যোগ্যতা আছে; কেননা প্রত্যেক

মানুষের ভিতরই স্বরূপ এবং বিশ্বরূপ-সমন্বিত সত্তা রহিয়াছে। মানুষ স্বরূপে এক, বিশ্বরূপে বহু। মানব জীবন এই স্বরূপ-বিশ্বরূপে সমন্বিত বলিয়াই তাহার নিত্য নূতন হইবার যোগ্যতা। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে কি ইহা বুঝা যায় না? প্রতি মানুষ ভাবে ও রূপে বহু। মায়ের নিকট মানুষ থাকে সন্তান ভাব লইয়া সন্তানরূপে; আবার যখন সেই মানুষই স্ত্রীর নিকট যায়, তখন সে স্বামীভাবাপন্ন; তাহার রূপও তখন অন্য প্রকার। সে-ই যখন নিজের সন্তানকে বুকে লয়, তখন সে পিতৃভাবাপন্ন। ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চোখ-মুখের চেহারা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপে মানুষের ভিতর অনন্ত ভাব ও মূর্ত্তি রহিয়াছে, যাহা প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়াই চলিয়াছে। যাহার জীবন যত ব্যাপক, তাহার বিশ্বরূপ-জীবন তত পরিস্ফুট। প্রতি অণুরও যে বিশ্বরূপ হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে, ইহাই তো গীতার বিশ্বরূপদর্শনের তাৎপর্য্য। বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে যাহার জীবন যত ব্যাপক, তাহার জীবনে ঘটনাও তত বেশী। যে জীবনে প্রতি ঘটনা সেই সেই ঘটনারূপেই হজম হইয়া যাইতেছে, কোন একটিতেই আটকাইয়া অগ্রগমনে বাধা জন্মাইতেছে না, সেই বিশ্বরূপ-জীবনই মুক্ত। এই ঐতিহাসিক বিশ্বরূপ-জীবনই পুরুষোত্তমজীবন।

মানুষ এই জীবনের পথে যতখানি অগ্রসর হয়, সে ততখানিই পুরুষোত্তম মানুষ। এই বিশ্বের সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াও যে মানুষ মুক্ত থাকিতে পারে, সেই মুক্ত মানুষ গড়িবার শাস্ত্রই পুরুষোত্তমশাস্ত্র। বর্ত্তমান জগতে গুরুরা যদি পুরুষোত্তম মানুষ হইতেন, তাহা হইলে শিষ্য লইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না, শিষ্যদেরও গুরু লইয়া বিপদে পড়িতে হইত না। স্বামী যদি এই পুরুষোত্তমজীবন লাভ করিতেন, পিতা যদি এই পুরুষোত্তমজীবন লাভ করিতেন, তাহা হইলে কি পরিবার জীবনের শৃঙ্খলা এমন করিয়া ভাঙ্গিতে পারিত? রাজা যদি এই পুরুষোত্তম-জীবন লাভ করিতেন, রাজ্য কি এমন বিদ্রোহী রূপ ধরিতে পারিত?

মানুষের জীবনের সকল স্তর যেখানে তৃপ্ত, সেইখানেই হয় মিলন; বিদ্রোহ তখন আর থাকিতে পারে না। শোষিত হয় বলিয়াই তাহারা বিদ্রোহ করে।

স্মৃতি—ব্রজলীলার সহিত বর্ত্তমান যুগের যে সংযোগ কোথায়, তাহা কিছু কিছু বুঝিলাম বটে। কিন্তু মনের ভিতর একটা প্রশ্ন যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—এ যুগের শোষিতেরা পুরুষোত্তম মানুষ কোথায় পাইতেছে? পাইলেই বা চিনিবার মত বুদ্ধি তাহাদের কই?

শ্রুতি—আমি তো বলিয়াছি গতিযুক্ত আদর্শই পুরুষোত্তমের স্বরূপ। আদর্শ-নিষ্ঠা থাকিলে আদর্শই একদিন মূর্ত্ত হইয়া ধরা দেয় বিশ্বরূপ-রূপে জীবনের কাছে। পুরুষোত্তম মানুষ বিশ্বে প্রত্যক্ষ আছেনই; তাহা না হইলে এই বর্ত্তমান আন্দোলন স্ফুরিতই হইতে পারিত না। আজ তাঁহাকে তুমি দেখিতে পাইতেছ না বটে; কিন্তু তাঁহাকে বুঝিবার ও জীবনে গ্রহণ করিবার সাধনা লইয়া বসিয়া থাকিলে একদিন তোমার জীবনেও তিনি মূর্ত্ত হইয়া ধরা দিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিনা সাধনায় কেহ কখন কাহাকেও পায় নাই। পুরুষোত্তমকে পাইয়া পুরুষোত্তমজীবন লাভ করিতে হইলে দৃঢ়তার সহিত নিজের ভিতরের আদর্শকে জমাইয়া ঘন করিয়া তুলিতে হইবে, অপরের ভিতর সেই আদর্শের প্রেরণা দিয়া নারীসংঘ রচনা করিতে হইবে। যে আদর্শের টানের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন না হইয়া মেয়েরা ঘর ছাড়িল, সেই আদর্শবোধ যদি তাহাদের ভিতর জাগরিত হয়, তবে তাহারা সকল দ্বন্দ্ব ভুলিয়া একত্র হইতে পারিবে; তখন সেই আদর্শ নারী সংঘের ধাক্কায় গড়িয়া উঠিবে উত্তম-পুরুষ, আদর্শবান পুরুষ। আদর্শবতী নারী ও আদর্শবান পুরুষের প্রাণখোলা মিলনের উপরেই গড়িতে হইবে ভবিষ্যৎ সমাজ। পুরুষোত্তম আছেন, আসিবেন। চিনিবার মত বুদ্ধিও মেয়েদের আদর্শই তাহাদের দান করিবে। প্রথমে মেয়েদিগকে কেন কোন্ পথ অবলম্বন

করিয়া জীবনপথের যাত্রা সুরু করিতে হইবে, তাহাই বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন ; তাহার পর তাহাদের পথই গন্তব্য স্থলকে গড়িয়া তুলিবে।

স্মৃতি—বর্ত্তমান যুগে পুরুষোত্তম মানুষ পাওয়া তো খুবই কঠিন। মেয়েদের যদি আদর্শ-বোধ আসে, আর সেই আদর্শের টানে নারী-সংঘ গড়িয়াই তুলিতে পারে, তাহা হইলে প্রয়োজনই বা কি বাহিরের কোনও পুরুষোত্তমকে পাওয়ার ? তুমি তো বলিয়াছ মানুষ নিজের মাঝেই নিজে স্বয়ংপূর্ণ, তখন আর অন্য মানুষের কি প্রয়োজন আছে ?

শ্রুতি—এখানে আবার ভুল করিতেছ, স্মৃতি। মানুষ নিজের মাঝেই নিজে পূর্ণ—পরিপূর্ণ সত্যের ইহা একটি দিক। প্রতি খণ্ড পূর্ণ মানুষের বাহিরেও একটি অখণ্ড সমগ্র তত্ত্ব রহিয়া গিয়াছে—ইহাও তাহার জীবনের অপর দিক। সকল খণ্ড পূর্ণ মানুষ যখন হাত ধরা-ধরি করিয়া দাঁড়াইতে পারে, তখনই সেই অখণ্ড সমগ্রকে মানুষ ধরিতে পারে। তাহা না হইলে খণ্ড-মানুষের কাছে সেই অখণ্ড একেবারেই অধরা হইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যে সেই অখণ্ডের স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব আছে বলিয়াই মানুষের মধ্যে বড় হইবার ক্ষুধা, সর্ব্বখণ্ডের সমন্বয়ে বাস্তবের দেশে অখণ্ডকে পাইবার খোঁচাও রহিয়াছে। মানুষকে বড় হইতে হইলে, অখণ্ডকে পাইতে হইলে, অপর খণ্ডের সঙ্গে তাহাকে মিলিতেই হইবে। মানুষের মধ্যে যদি এই অখণ্ডের সত্তা অনাদি হইতে অনন্তে না থাকিত, তবে অন্য মানুষের সহিত মিলন তাহার পক্ষে সম্ভবই হইত না। এই মিলন দুইভাবে হইতে পারে। প্রথমতঃ খণ্ড ৩ ও খণ্ড ৫ তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষত্ব না খোয়াইয়া মিলিতে পারে অখণ্ড ১৫-এর মধ্যে ; এই ১৫ই পুরুষোত্তমবস্তু। দ্বিতীয়তঃ প্রতি মানুষের মধ্যে স্বয়ংপূর্ণ একটী অখণ্ডত্বও আছে, কিন্তু সে তাহার বিশেষত্বকে বাদ দিয়া ; যেমন অখণ্ড ১এর মাঝে খণ্ড ৩ ও খণ্ড ৫ নিজ নিজ বিশেষত্ব বাদ দিয়া এক অখণ্ড হইতে পারে। যদি বিশেষত্বকে রাখিতে চাই, বিশেষত্বকে রাখিয়া অন্য খণ্ডের সঙ্গে মিলিতে চাই,

এবং অখণ্ডের উপলব্ধির আশাও রাখি, তবে আমাদের পুরুষোত্তম-বস্তু ঐ ১৫-এর শরণাপন্ন হইতেই হইবে। ইহা ব্যতীত খণ্ডের সংঘ গড়া সম্ভবই নয়। খণ্ড মানুষ স্বয়ংপূর্ণ বটে, কিন্তু তাহার ভিতর একটী অখণ্ড নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব লুকাইয়া রহিয়াছে বলিয়াই অপর খণ্ডের সহিত যুক্ত হইবার ব্যাকুলতা তাহার পক্ষে অনিবার্য্য হইতেছে।

মানুষ যে অনন্ত; তাহার সেই বড় হইবার ক্ষুধা কে মিটাইবে? একটি খণ্ড স্বয়ংপূর্ণ মানুষ প্রতি অন্য এক খণ্ডের ভিতর যতখানি রহিয়াছে, ততখানিই সে অপর খণ্ডকে আস্বাদন করিতে পারিবে। তাহার বাহিরেও যে অনন্ত বিশ্ব পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার আস্বাদন করিবে কি করিয়া? কোনও খণ্ড বিশেষত্ব অপর খণ্ড বিশেষত্বের ভিতর পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। মানুষ তো শুধু বর্ত্তমান জীবনটুকু লইয়াই নয়, জীবনের অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ মিলাইয়াই সে একটী পরিপূর্ণ মানুষ। এই অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ যাহার জীবনে যত প্রত্যক্ষ, সেই পুরুষোত্তম মানুষের ভিতরেই অন্য খণ্ডগুলি তত হাত ধরা-ধরি করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে পারে। অখণ্ড নির্ব্বিশেষের স্পর্শ ব্যতীত সমস্ত খণ্ড বিশেষ একত্র মিলিতেই পারে না। এই জন্যই সর্ব্ববিশেষত্বঘন নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের প্রয়োজন রহিয়াছে, যাহার ভিতর ডুবিয়া সকল বিশেষত্বগুলি প্রত্যেকের প্রতি অঙ্গের কান্না জুড়াইতে পারে। ত্রিকালে অবাধগতি পুরুষোত্তম মানুষ ব্যতীত কেহ কি খণ্ডের সংঘ গড়িতে পারিবে? বিশ্বের সকল স্ত্রী-পুরুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ আদি সকলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে মিলাইয়া পরস্পর পরস্পরের হাত ধরা-ধরি করিয়া দাঁড়াইবে এবং যে যাহার ছন্দ বজায় রাখিয়া অন্যের প্রকাশের পথ খুলিয়া দিবে, এইরূপ আশা ও বিশ্বাস তত্ত্বদৃষ্টিতেই সম্ভব; কিন্তু ব্যবহারিক এই বাস্তব বিশ্বে ইহা তো কোনও দিনই ষোল আনা বাস্তবে পরিণত হইবে না। এই তত্ত্বকে শুধু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঘন করিতে করিতে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রকে জয় করিতে করিতে

আগাইয়া চলিতে হইবে। কোনও দিন একান্তভাবে এই তত্ত্ব বাস্তবকে হজম করিবে, এ আশা পাগলের খেয়াল মাত্র। অথচ হজম করিবার জন্য ছুটিয়াও চলিতে হইবে অনন্ত ধৈর্য্য, আশা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে বুকে লইয়া, বেদনাময় জীবন লইয়া। সেইজন্যই তো ১৫-এর, সেই পুরুষোত্তমবস্তুটীর প্রয়োজন রহিয়াই যাইতেছে। ১৫-এর, সেই পুরুষোত্তমবস্তুটির স্থলাভিষিক্ত হইতেছেন বাস্তবের দেশে রাজা, গুরু ও সংঘ কর্ত্তা।

স্মৃতি—তুমি যে আত্মসমর্পণের কথা বলিতেছ, বর্ত্তমান সময়ে ছেলে মেয়েরা কেহই তো বড় কাহাকেও মানিয়া চলিতে চাহে না; আত্মসমর্পণের কথা তাহারা শুনিতেই পারে না, প্রত্যেকেই চায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য লইয়া চলিতে।

শ্রুতি—ইহা ঠিক কথা নয় স্মৃতি। নানা স্থানে নানা রূপে প্রত্যেকেই আত্মসমর্পণ করিয়া রহিয়াছে। ব্যষ্টিমাত্রই সমষ্টির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া চলিয়াছে। কংগ্রেসীরা ভারতবর্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, কম্যুনিষ্টরা লেলিন ও রাশিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছে। ব্যাপক যে কোনও আদর্শের নিকটই মানুষ আত্মসমর্পণ করে তাহা জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক। সমুদ্রের কাছে আত্ম-সমর্পণেই নদীর জীবন। নদী সমুদ্রে আত্মসমর্পণ করিয়াই জীবন্ত তাজা। মানুষের ক্ষুদ্র আমি বৃহতের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই আজ তাহার জীবন বিচ্ছিন্ন, শুষ্ক এবং মলিন। নদীর সহিত সাগরের মিলনের পথে যে বাধা, ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবার নামই আত্মসমর্পণ। গঙ্গাসাগরসঙ্গম তাই মহান তীর্থ—কখনও গঙ্গার বুকে সাগর, কখনও সাগরের বুকে গঙ্গা। প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যলাভ করিবার জন্যই আদর্শবান মানুষের নিকট আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আত্মসমর্পণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খোয়া তো যায়ই না, বরং তাহা বিকাশ ও প্রকাশ লাভ করিতে সাহায্যই পায়। আত্মসমর্পণের অর্থ নিজের বিশেষত্বকে

নষ্ট করা নয় ; নিজের যে সংকীর্ণতা, যে অহংকার বৃহতের সঙ্গে যোগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, যাহা মানুষের একটি স্বভাব, সেই বিচ্ছিন্নতাকে মুক্ত করিয়া দেওয়াই, সমগ্রের বোধ জাগ্রত করাই আত্মসমর্পণের গূঢ় প্রয়োজন। আত্মসমর্পণ করিতে হইতেছে সকলকেই, স্বীকার করে না শুধু মুখে। এই আত্মসমর্পণ যদি বিকৃত আত্মসমর্পণ না হইয়া যোগ্য স্থান বুঝিয়া হইত, তাহা হইলে মানুষ সার্থক হইতে পারিত। অর্জ্জুনের পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণই তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। রামদাসের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াই শিবাজী সার্থক হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট আত্মসমর্পণের উজ্জ্বল আদর্শই বিবেকানন্দ। আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়া আত্মার সঙ্কুচিত অবস্থারই নির্ব্বাণ লাভ হয়। আত্মসমর্পণই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-লাভের মূল রহস্য।

স্মৃতি—তুমি যে বলিলে অনুমান ও প্রত্যক্ষ-সমন্বিত জীবন যাঁহার, তিনিই পুরুষোত্তম মানুষ এবং তিনিই ঐতিহাসিকরূপে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। সে তো দ্বাপর যুগের কথা। বর্ত্তমানে কৃষ্ণ-জীবনও তো আনুমানিক হইয়াই পড়িয়াছে। আনুমানিক কৃষ্ণ-জীবন যদি বর্ত্তমানে কোন পুরুষের ভিতর প্রত্যক্ষ হইত, তবেই না বর্ত্তমান যুগ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিত ?

শ্রুতি—আনুমানিক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনই বর্ত্তমান যুগে যুগ-সমস্যার সমাধানরূপ পুরুষোত্তমদর্শন দান করিবার জন্য ধরায় অবতরণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়রস আস্বাদন করিতে দ্বাপরের শেষভাগে যশোদাদুলাল কৃষ্ণগোপাল বৃন্দাবনে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনিই আবার সেই ব্রহ্ম ও মায়ার সমন্বয়তত্ত্ব জগতের বুকে ছড়াইয়া দিবার জন্য কলিকলুষনাশন শচীর দুলাল গৌরগোপালরূপে নদীয়ায় অবতরণ করিয়াছিলেন। পুনরায় ব্রহ্ম এবং মায়ার সেই সমন্বয়তত্ত্বকেই পরিপূর্ণ রূপে জগতকে আস্বাদন করাইবার জন্য বর্ত্তমানে যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক

গৌরীদুলাল শ্রীনিত্যগোপাল পানিহাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি জ্ঞানানন্দ, তিনি নিত্যগোপাল। তিনি নিত্যসত্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপী জ্ঞানানন্দ। আবার তিনিই এই গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বিশ্ব পালনকারী, তাই তিনি গোপাল; অথচ তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনি নিত্য। নিত্য ও অনিত্য এবং ব্রহ্ম ও মায়ার সমন্বয়মূর্ত্তিই শ্রীনিত্যগোপাল। পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের দেওয়া শাস্ত্র ও জীবনদর্শনই পুরুষোত্তমদর্শন। এই পুরুষোত্তমদর্শনের আলোতেই বর্ত্তমান যুগ-সমস্যার সমাধান খুঁজিতে হইবে।

স্মৃতি—আচ্ছা ভাই, তুমি যে স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্যের কথা বলিতেছ, তাহা কি বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতাই এদেশে আনিয়া দেয় নাই? তুমি দ্বাপর যুগের রাধাকৃষ্ণকে লইয়া টানাটানি করিতেছ কেন?

শ্রুতি—পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশে স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্যের একটা ব্যাপক আন্দোলন আনিয়াছে একথা খুবই সত্য; কিন্তু ভারতের স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্য প্রথমে ঘোষণা করিয়াছেন ভারতেরই ইতিহাস-প্রসিদ্ধা নারী বিপ্লবময়ী রাধারাণী। ভারতের বর্ত্তমান নারীপ্রগতির আদর্শও তিনিই। রাধাচরিত্র যদি ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষে প্রকট না হইত, নারীচরিত্রে একটী বিরাট অপূর্ণতা রহিয়া যাইত। এই নারীপ্রগতির যুগে বিশ্বদরবারে উপহার দিবার মত ভারতবর্ষের কোনও চরিত্র থাকিত না। রাধাই ভারতের শেষ নারীচরিত্র, সীতা সাবিত্রী নন। সীতাসাবিত্রীচরিত্রের ক্রমপরিণতিই রাধা। নারীজীবনের সব বেদনা ও তাহার প্রতিবাদের মূর্ত্ত বিগ্রহই রাধা। রাধা শুধু দেবীই নন্; ভাবুকরসিক বাঙ্গালীর চোখে তিনি শুধুই মানবী। ভারতবর্ষে যদি আর সব গ্রন্থ মুছিয়াও যায়, একমাত্র ভাগবত ও রাধাকৃষ্ণ বাঁচিয়া থাকেন, তবে লক্ষ বৎসর পরেও বিশ্ব বুঝিতে পারিবে সভ্যতার কোন্ উচ্চতম শিখরে সে আরোহণ করিযাছিল।

ইংরেজ শাসন যখন এদেশে কায়েম হইল, তখন গতিশীল পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা প্লাবন আসিয়া স্থিতিশীল ভারতবর্ষের

সভ্যতার মূলে আঘাত করিল। দীর্ঘদিনের দিদিমা, ঠাকুমাদের পূর্ব্ব ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া মেয়েদের ঘরের বাহিরে টানিয়া বাহির করাই পাশ্চাত্য সভ্যতার কৃতিত্ব। সেই সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হওয়ায় ব্রাহ্ম মেয়েরা স্কুলকলেজে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করে। মেয়েদের শিক্ষা কিংবা স্বাধীনতার সত্য প্রয়োজনবোধ ব্যাপকভাবে জাগরিত হওয়া অপেক্ষা আবেষ্টনগত চাপই তাহাদিগকে পথে বাহির করিয়াছে। সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্যের কৃচ্ছ্রচ্ছতাও এই আবেষ্টনগত চাপের অন্যতম একটি প্রধান কারণ। তাই আইনের শাসনে সতীদাহের বাহিরের রূপটা বদলাইল বটে, কিন্তু ভিতরের জ্বালা নিভিল না। মেয়েদের ঘরের বাঁধ কেন যে টুটিল, তাহার কারণ যেমন মেয়েরাও জানে না তেমনি সমাজপতিরাও সে সম্বন্ধে সচেতন নন। পাশ্চাত্যের অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া উচিত, "অতএব" শিক্ষায়তন সৃষ্টি হইল। কিন্তু পাশ্চাত্যের সমাজকাঠামো আর ভারতবর্ষের সমাজকাঠামো তো একেবারেই এক নয়। তাই তাহাদের নজির দেখাইয়া "অতএব"—এর সিদ্ধান্ত লইলে তাহা আমাদের দেশে খাপ খাইবে কেন? যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণার ফলে ঘটিয়াছে, তাহাকেই আজ সচেতন ভাবে বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে, তাহার সুস্থ ব্যবস্থাকে বাহির করিয়া লইয়া শাস্ত্রের মধ্যে তাহাকে রূপ দিতে হইবে। তাহা না হইলে রাস্তায় বাহির হইয়া মেয়েরাও শান্তি পাইতেছে না, সমাজের স্বাস্থ্যও টিকিতেছে না।

যাঁহারা তথাকথিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারাই কি জানেন তাঁহারা কি চান, পূর্ব্বে তাঁহাদের অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল কেন এবং এখন তাঁহারা সে ব্যবস্থা কেনই বা মানে না, এবং তাঁহাদের ভবিষ্যৎই বা কি? শতকরা ২।৪টি মেয়ে ছাড়া সকলেই গড্ডালিকাস্রোতে পড়িয়া লেখাপড়া গীতবাদ্যনাচ শেখে, তাহার পর বাপের টাকা থাকিলে বিবাহ করে, নয় তো এটা-ওটা করিয়া দিন

যাপন করে। ভগবানের কৃপায় রাষ্ট্রের ক্ষেত্র তাহাদিগকে আহ্বান করায় তাহাদের তবু একটি স্থান জুটিয়াছে। কিন্তু সমাজব্যবস্থার মূল বদলাইতে না পারিলে, নারীপুরুষের স্থান ও মান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা মূলে না বদলাইলে সমাজের স্বস্থ হওয়ার কোন উপায় নাই। যে পরিবর্ত্তনের চেহারা দেখা যাইতেছে, তাহাও তো কয়েকটি শহরের। ভারতবর্ষে সাত লক্ষ গ্রাম। এখনও এই সকল গ্রামে লক্ষ লক্ষ মেয়েরা অশিক্ষিত অবস্থায় যে অন্ধকারে জীবন যাপন করিতেছে, তাহার বর্ণনা প্রয়োজনহীন। পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহাদের আলোর সন্ধান দিতে পারে নাই। আজও সেখানে কোন অনুকূল অবস্থাই গড়িয়া উঠে নাই। দীর্ঘ দিনের ব্যবস্থা ও পরাধীনতা মেয়েদের এমন অসহায়, অক্ষম করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহাদের আর মানুষ নাম দেওয়া চলে না।

নারী-প্রগতিকে সার্থক করিতে হইলে ভারতের অতীত আদর্শের ভিত্তির উপর নবীনের সৌধ গড়িতে হইবে। ভারতীয় সভ্যতাকে ভারতের শাস্ত্রের ভিতর দিয়া দুঃখী নারী-সমাজের নিকট পৌছাইতে হইবে। সীতার একনিষ্ঠার উপর, আদর্শের উপর স্থিত হইয়াই রাধার বহুর ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার যোগ্যতা। শ্রীরাধা গতির মূর্ত্ত বিগ্রহ। ভারতবর্ষের মেয়েদিগকে সীতাজীবনেরই অপরাংশ হিসাবে রাধাজীবনকে স্বীকার করিতে হইবে। এই স্থিতিগতি মিলিয়া যে নারী-প্রগতি, তাহাই ভারতের নারী-প্রগতি। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের মেয়েদিগকে এই স্থিতি-গতিসমন্বিত প্রগতি বুঝিয়া লইয়া সেই পথে চলিতে হইবে। এই নারী-প্রগতি সফল হইবে পুরুষোত্তমকে কেন্দ্র করিয়াই। পাশ্চাত্য নারী প্রগতির ভিতরে পুরুষোত্তমের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। মনে হয় যেন, যে-কোনও পুরুষকে কেন্দ্র করিয়াই পাশ্চাত্যের নারী-প্রগতি সার্থক হইতে পারে। কেননা তাহাদের সভ্যতার ভিতর স্থিতি অপেক্ষা গতির দিকটাই প্রধানভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের সভ্যতার ভিতর স্থিতি-গতিসমন্বিত পুরুষোত্তমের জীবনদর্শন

রহিয়াছে। ভারতের নারী-প্রগতি তাই পুরুষোত্তমকে কেন্দ্র করিয়াই সত্য বাস্তব। সমাজের পুরুষ ও নারী যখন পুরুষোত্তমভাবাপন্ন হইবে, তখনই নারী-প্রগতির উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিবে। পৌরুষহীন নারী-পুরুষের যে প্রগতি, তাহা কিছুদূর যাইয়া আট্‌কাইয়া যাইবে এবং বর্ত্তমানের চেয়েও বীভৎস প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে। একমাত্র পুরুষোত্তমস্তরেই প্রগতি অবাধ ও অব্যাহত, এবং এই স্তরেই দুই দুইকে সৃষ্টি করে।

স্মৃতি—আচ্ছা, যদি স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য শাস্ত্রের ভিতর দিয়া না দিয়া রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া দেওয়া যায়, তাহাতে কি স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করা যাইবে না ?

শ্রুতি—বর্ত্তমানকালে শাস্ত্র এবং রাষ্ট্র পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্যই আজ তুমি এ প্রশ্ন তুলিতেছ। পূর্ব্বের শাস্ত্রকর্ত্তারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই শাস্ত্রের ভিতর দিয়া দিতেন। আজকাল আর তাহা নাই; জীবন এখন খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এসেমব্লীর ব্যবস্থা হইতে বাধ্য-বাধকতাপূর্ণ আইন পাশ করিয়া যদি কোন স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা হইবে যান্ত্রিক স্বাধীনতা, যান্ত্রিক সভ্যতা। এই যান্ত্রিক সভ্যতাই বর্ত্তমানে চলিতেছে। জীবন্ত ধর্ম্মের আইন গড়িয়া উঠে প্রাণের ভিতর দিয়া সহজ জীবনের সহজ স্বাধীনতার উপর। স্বামীস্ত্রীর সহজ জীবনের চলার পথে বোল আনাই যদি রাষ্ট্রের আইন-ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হয়, তাহা কি অশোভনীয়, অমর্য্যাদাপূর্ণ হয় না ? রাষ্ট্রের যতটুকু করিবার আছে, সে তাহা করিবে। তাহার পরেও যদি শাস্ত্র-নিহিত ভিত্তিমূলের চিন্তাধারা বদলান না যায়, তবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থারও কোন যৌক্তিকতা থাকিবে না, উহার ভিত্তিও দৃঢ় হইবে না। সমস্ত পরিবর্ত্তনের অন্তর্নিহিত চিন্তাধারাটা বদলানও সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন। শাস্ত্রের ভিতর দিয়া নারীজাতির নিজস্ব অধিকার ঐ স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্য যেদিন ঘোষিত হইবে, এবং নারী তাহাকে নিজ চিন্তাধারার ভিতর দিয়া আয়ত্ত করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবে, সেইদিন নারী পাইবে তাহার রাষ্ট্র ব্যবস্থার

দ্বারা প্রদত্ত সত্য অধিকার, তাহার সত্য সম্মান। কেবল বাহির হইতে আইন-করা ব্যবস্থায় জীবনের পুরাপুরি মীমাংসা হয় না।

স্মৃতি—সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য পুরুষদের একপত্নীব্রত, নারীদের একপতিব্রত বর্ত্তমানে সকলের কাছে আদরণীয় হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়। নারীপ্রগতির দ্বারা এই ব্রত কি রক্ষিত হইবে ?

শ্রুতি—নারীপ্রগতির প্রথম ও প্রধান অর্থ হইতেছে পুরুষের ন্যায় নারীরও স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার স্বীকারের ভিত্তিতে একটি সমগ্র অখণ্ড সমাজ সৃষ্টি করা। ইহার সঙ্গে মানুষের প্রকৃতির মূলে বহুকে আস্বাদন করিবার যে আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, সে প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। প্রত্যেক নারী-পুরুষের ভিতরই বহুকে আস্বাদন করিবার একটি খোঁচা আছে, যেমন আছে এককে আস্বাদন করিবার। বহুকে আস্বাদন করার অর্থ বহু দেহকে অবলম্বন করাই নয় ; বহু যোগ্যতাকে আস্বাদন করা, বহু প্রকাশকে আস্বাদন করাই বহুকে আস্বাদন। একের ভিতর বহু-দিক থাকিলে, বহু প্রকাশ থাকিলে, এককে লইয়াই বহুর আস্বাদন সার্থক করা যায়। নারী-প্রগতি আজ নারী পুরুষকে সর্ব্বক্ষেত্রের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার প্রেরণাই যোগাইতেছে। পুরুষোত্তমস্তরে যাহা 'এক', তাহা এক ও বহুর সমন্বয়। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীই একাধারে এক ও বহু হইয়াই একপতি বা একপত্নী হইবেন। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এক ও বহুর সমন্বয় থাকায়, একান্ত এক বা একান্ত বহু লইয়া কাহারও খোঁচা মিটিতে পারে না। একান্ত এককে লইয়া থাকিলে জীবনের গতি মন্থর হইতে হইতে শেষে আটকাইয়া যাইবে ; পক্ষান্তরে একান্ত বহুকে লইয়া থাকিলেও জীবনে আসিবে স্থিতিহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ; যাহার পরিণাম ফল হইবে সমাজের ভিতরে নারী-পুরুষ লইয়া পারস্পরিক কাড়াকাড়ি। অথচ একান্ত এক-পতি ও একান্ত একপত্নী হইয়া, পতির একপতিত্বের এবং পত্নীর একপত্নীত্বের আকাঙ্ক্ষাও মিটিতে পারে না।

পুরুষ যদি পুরুষোত্তমজীবন লাভ করে, এবং নারীও যদি পুঃ
লাভ করে, তখনই তাহাদের মিলনের ভিতর থাকিবে এক ও বহুঃ
পতির জীবনে বিশ্বরূপ জীবন থাকায়, তাহার সর্ব্বক্ষেত্রে দাঁড়াইবার উপযোগী বহুমুখীন প্রতিভা থাকায়, নিত্য নব নব জীবনলাভের যোগ্যতা থাকায় এক পতি লইয়াই পত্নীর একপতিত্ব ও বহুপতিত্বের আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। সেইরূপ নারীজীবনেও বিশ্বরূপ থাকায়, এক ও বহুসমন্বিত পুরুষোত্তমজীবন থাকায়, এক পত্নী লইয়াই পতির একপত্নী ও বহুপত্নী পাওয়ার সাধ পূর্ণ হইবে। পুরুষোত্তম নারী ও পুরুষোত্তম পুরুষের মিলনেই প্রগতি অব্যাহত থাকিবে। শরৎচন্দ্রের "শেষ প্রশ্নে" কমলের যে বহু পতির উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা শুধু এইটাই দেখাইবার জন্য যে, নারী-প্রকৃতির মাঝেও বহু পুরুষ পাইবার একটি সনাতন খোঁচা রহিয়াছে, যাহাকে একপতিব্রত দ্বারা দাবাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না। তাহা হইলে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, নারী অসংখ্য পুরুষের সঙ্গে মিলিত হইয়াই তাহার প্রগতির খোঁচাকে সার্থক করিবে? পুরুষোত্তম-দর্শন বলিবে যে, এইভাবে অসংখ্য পুরুষের সহিত মিলিত হওয়াও তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা তাহার জীবনে যে একের দিকের খোঁচাও তুল্য ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। একত্বহীন অসংখ্যের সঙ্গে তাহার মিলন দেহের দিক হইতেও যেমন অসম্ভব, মনের দিক হইতেও সেইরূপ অসম্ভব ও অশুচি। একজন পুরুষ বা নারী দেহ দিয়া কয়জনের সহিত মিলিত হইতে পারে?

"এক" যোগায় স্থিতি, "বহু" যোগায় রস; বহুসমন্বিত একই নিতুই নব নব। প্রকৃতির অন্তরে এই এক ও বহুর সমন্বয় আছে বলিয়াই কোন যুগের সমাজব্যবস্থায় এক পুরুষের বহু নারীর পাণি-গ্রহণ, কখনও বা এক নারীর বহু পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত হইবার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সে সমাজ উহাতে উচ্ছৃঙ্খলও হয় নাই, অপবিত্রও হয় নাই। নমনধর্ম্মশীল পুরুষোত্তমজীবন যে সমাজের আদর্শ, সেই জীবন্ত

সমাজের তাৎকালিক আবেষ্টনের মধ্যে এক পুরুষের বহু পত্নী এবং বহু পুরুষের এক পত্নী গ্রহণের অবকাশ নিশ্চয়ই থাকিবে। তবে মনে হয়, মানুষের প্রকৃতির ক্রমবিবর্ত্তনের ঝোঁক একপতি বা একপত্নী গ্রহণ করার দিকেই এবং বর্ত্তমানে ইহাই সাধারণ নিয়ম।

স্মৃতি—ভাই, তোমার কথা শুনিয়া আর একটা প্রশ্ন মনে উঠিতেছে, শ্রীরাধা এবং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক তো পরকীয় সম্পর্ক। এই সম্পর্কটীকে সমাজ জীবনে, পরিবারের ভিতর কিরূপে হজম করিবে বুঝাইয়া বল না ?

শ্রুতি—তোমরা পরকীয় সম্পর্কটাকে যেরূপে বুঝিয়াছ, উহা তো পরকীয় শব্দের নিগূঢ় অর্থ নহে। মানুষ যখন নিজকে ভোক্তারূপে সাজাইয়া অপরকে ভোগ্যরূপে ভোগ করে তখন ভোগ্য হয় ভোক্তার স্বকীয়। তখন ভোগ্যের নিজস্ব কোনও সত্তা থাকে না, কর্তৃত্ব থাকে না; ভোগ্য হয় ভোক্তার সম্পূর্ণ অধীন। আর ভোক্তা-ভোগ্য যখন উভয়ে স্বাধীনভাবে থাকিয়া শুধু ভালবাসার ভিতর দিয়া উভয়ে উভয়কে ভোগ করে, তখনই সে সম্বন্ধ পরকীয়। সবদিক দিয়া সম্পূর্ণ নিজের করিয়া না-রাখিয়া স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া-রাখিয়া যে পাওয়া, তাহাই পরকীয়রূপে পাওয়া। রবীন্দ্রনাথ এই কথাই লিখিয়াছেন—

সংসারেতে আর যাহারা আমায় ভালবাসে,
তারা আমায় ধরে রাখে বেঁধে কঠিন পাশে,
তোমার প্রেম যে সবার বাড়া, তাই তোমার এই নূতন ধারা
বাঁধনাকো লুকিয়ে থাক, ছেড়েই রাখ দাসে।

কঠিন পাশে বাঁধিয়া রাখিয়া ভালবাসাই স্বকীয়; আর ছাড়িয়া রাখিয়া ভালবাসাই পরকীয়। এই ছাড়িয়া-রাখিয়া ভালবাসার ভিতর দিয়াই মানুষ সবাইকে সত্য সার্থক করিয়া পায়—স্বামী স্ত্রীকে পায়, পিতা পুত্রকে পায়, গুরু শিষ্যকে পায়, রাজা প্রজাকে পায়। একান্ত

স্বকীয়রূপে, ভোক্তারূপে পাইতে যাইয়া পুরুষ আজ স্ত্রীকে পাইতেছে না, পিতা আজ পুত্রকে পাইতেছে না, গুরু আজ শিষ্যকে পাইতেছে না, রাজা আজ প্রজাকে পাইতেছে না। ইংরেজ আইনের পাশে ভারতবর্ষকে বাঁধিয়া রাখিতে যাইয়া আজ আর ভারতকে পাইতেছে না। যদি ছাড়িয়া-রাখিয়া ভারতবর্ষকে পাইতে চাহিত, তাহা হইলে সেই ছাড়িয়া-রাখার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষকে সে পাইত। সবাই আজ কঠিন পাশের বাঁধন ছিঁড়িয়া মুক্ত হইবার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। পরকীয় শব্দের বিকৃত অর্থ ই আজ সমাজে চলিতেছে।

প্রত্যেক মানুষ যে নিজের কাছেও নিজে পরকীয়। স্ত্রী যখন শুধু স্বামীরই, তখন সে স্বামীর ও নিজের কাছে স্বকীয়; আবার সেই স্ত্রীই যখন পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের, তখন স্বামী ও নিজের কাছে সে-ই পরকীয়। যাহার যত বেশী ব্যাপক জীবন, সে তত বেশী নিজের নিকটও নিজে পরকীয়। বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে মানুষ যখন বিচরণ করে, তখন তাহার নিজের নিকট ও আত্মীয়ের নিকট সে হয় পরকীয়। যখন একজন জজের পিতাকে পুত্রকে কোর্টে হুজুরই বলিতে হয়, তখন তাহাদের পিতাপুত্রের সম্বন্ধের মধ্যে স্বকীয়ত্ব থাকে না। সেই সময়ের সেই পিতাপুত্রের সম্বন্ধই হয় পরকীয়। আমার নিজের উপরেই আমার দাবী নাই, কেননা "আমি" বলিতে শুধু আমাকেই বুঝায় না। আমি আমার মা বাবা, ভাই বোন, স্বামী স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব সকলের। এজন্যই মানুষের আত্মহত্যা করিবার কোন অধিকার নাই। আত্মা বলিতে কেবল আমিই বুঝায় না। আমি যে সকলের, সকলেই যে আমার; মানুষের জীবন একটি বিরাট তত্ত্ব। ইহাকে পরিপূর্ণরূপে না বুঝিয়া একটা মাত্র দিক লইয়া সমাজ গঠন করিতে গিয়া সমাজ-যন্ত্র বিকল হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক মানুষই যুগপৎ স্ব এবং পর।

আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভিতর যে তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা কি কোনদিন ভাবিয়া দেখিয়াছ? এ দেশের একটি মেয়ে পঞ্চপতি লইয়াও সতীরূপে জগতে পূজিতা। প্রত্যেক মানুষের বহু হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে, দ্রৌপদী তাই পঞ্চস্বামীকে পাঁচরূপেই সেবা করিতেন। দ্রৌপদী যখন যুধিষ্ঠিরের নিকট থাকিতেন, তখন তিনি তাঁহার স্বকীয় রূপেই থাকিতেন, তাঁহার হইয়াই থাকিতেন; ভীম প্রভৃতি অন্য ভাইদের নিকট দ্রৌপদী তখন পরকীয়। ভীমাদির মধ্যে যাহার নিকট যখন আবার দ্রৌপদী যাইতেন, তখন তিনি তাঁহার মত হইয়াই যাইতেন, যুধিষ্ঠিরাদি অপর চারিজনের নিকট তখন থাকিতেন পরকীয়রূপে। এই যে বহু হইবার যোগ্যতা তিনি পাইয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল তাঁহার শক্ত অহং গলাইয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আমির মাঝে ডুবাইয়া দেওয়া। সেইজন্যই তিনি নমনধর্ম্মশীল হইতে পারিয়াছিলেন; যখন যাঁহার কাছে থাকিতেন, তখন তাঁহারই মতন হইতে পারিতেন। গোড়ায় তাঁহার যে অদ্বৈতবুদ্ধি ছিল, বিশ্বরূপ জীবন ছিল, সেই অদ্বৈতবুদ্ধি ও বিশ্বরূপ জীবন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভাইয়েরও ছিল, তাঁহারাও পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবনে স্ব স্ব জীবন অর্পণ করিয়া অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্যই দ্রৌপদী পঞ্চপতির সেবা করিয়াও সতী। যুধিষ্ঠিরাদি যদি শ্রীকৃষ্ণের ভিতর আত্ম-সমর্পণ করিয়া অদ্বৈত না হইতেন, এবং নিজেরাও নমনধর্ম্মশীল হইতে না পারিতেন তাহা হইলে দ্রৌপদী কিছুতেই পাঁচ পতির সেবা করিয়া সতী থাকিতে পারিতেন না।

সৎস্বরূপ ব্রহ্মের ভিতর যে নারী ডুবিলেন, যুক্ত হইলেন, তিনিই তো সতী। ছন্দই সতীত্ব। সতীত্ব তো বাহিরের কোন একান্ত একটি রূপই নয়। ভারতীয় সমাজে এবং সাহিত্যে দ্রৌপদীর আসন তো কোন নারীর চাইতে নীচে নয়। একও সত্য, বহুও সত্য, যদি একে বা বহুতে প্রকৃতির পরিপূর্ণ স্বাধীন বিকাশ জমাট বাঁধিয়া উঠে। কাহারও জীবনের

এই বিকাশের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করিলে চলিবে না। বৈষ্ণবসম্প্রদায় পরকীয় রসকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, পরকীয় ভাবই মুক্ত জীবনের ভাব। সমস্ত বিশ্বকে যে পরকীয়রূপে দেখিল, সমস্ত বিশ্বের নিকট সে পরকীয়রূপে, অধররূপে রহিল। বিশ্বকে যখন মানুষ ভালবাসে, তখন সে নিজের কাছেই নিজে পরকীয় হয়। এই মুক্ত পুরুষ ও মুক্ত নারীজীবনের সমকক্ষতার উপরই গড়িতে পারে নির্ম্মল মুক্ত সমাজ। জীবন্ত ও গতিশীল পরিবার গড়িতে হইলে এই পরকীয় সম্পর্কটীকে পরিবারে লইতেই হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকেই একথা মনে রাখিতে হইবে যে, অপর কোন মানুষ, বস্তু বা ঘটনা এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত তাহার একান্ত ভোগ্য নহে, উহাদের প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব স্বাধীন সত্তা আছে।

স্মৃতি—তুমি বলিয়াছিলে যে, প্রত্যেক মানুষের ভিতর পুরুষ ও প্রকৃতি ভাব দুই-ই রহিয়াছে, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতেছি না। আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বল না!

শ্রুতি—দার্শনিক ভাবে একথা বুঝাইয়াছি। মানুষের মধ্যে যে একত্বের দিক, তাহাই পুরুষভাব এবং তাহার যে বহুত্বের দিক, তাহাই প্রকৃতিভাব। একত্ব ও বহুত্বের এই দুই ভাবই প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারীর ভিতর রহিয়াছে। কোনও কোনও পুরুষ যে বাহিরে, বাহিরের মেয়েদের নিকট যায়, ইহার কারণ কি জান? ঘরে যে তাহাদের স্ত্রী আছে, তাহারা তো তাহাদের একান্ত ভোগ্য বস্তু। নিজেদের যত অযোগ্যতাই থাকুক, মেয়েদের নিকট হইতে সেবা আদায় করাই তাহাদের কাজ; কেননা তাহারা যে পুরুষ, তাহারা যে স্বামী। কিন্তু সেই স্বামী বেচারাদের ভিতরেও তো আবার প্রকৃতিভাব রহিয়াছে। সেইজন্য তাহাদের ভিতরেও সেবা করিবার ইচ্ছা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে; সেই সাধ পূর্ণ করিবার জন্যই তাহারা বাহিরের নারীকে চায়। ঘরের স্ত্রীকে যদি একান্ত ভোগ্যবস্তু বলিয়া, স্বকীয় বলিয়া ধরিয়া না লইত, প্রাণ-খোলা ভালবাসার

ভিতর দিয়া স্বাধীনভাবে সম-মর্য্যাদা দান করিয়া পরস্পরকে পরকীয় করিয়া রাখিতে পারিত এবং নারীরাও যদি বিশ্বরূপ হইত, ব্যক্তিগত জীবন এবং বিশ্বরূপ জীবনের সমন্বয় বুঝিত, তাহা হইলে ঘরেই উভয়ে উভয়ের সেবা করিয়া তাহাদের সেবা করিবার সাধ মিটাইতে পারিত। বাহিরে যাইবার আর প্রয়োজন হইত না। মেয়েরাও ঘরের ভিতর অবাধ স্বাধীনতা, মর্য্যাদা ও আদর পাইয়া তৃপ্ত হইত। ঘরের বাহিরে আসিয়া বাহিরের মেয়ে বলিয়া কলঙ্কের পশরা মাথায় করিয়া বহন করিতে হইত না। বাহির আর একান্ত বাহির থাকিত না, ঘরও একান্ত ঘর থাকিত না।

ঘরেই বাহির,বাহিরেই ঘর—এই ভাবে ঘর বাহিরের সমন্বয় করিতে না পারিলে জীবন্ত, তাজা, ছন্দের সংসার গড়িবে কিরূপে? ঘর এবং বাহিরের বিচ্ছিন্নতাই এমন করিয়া পরিবার জীবন, সমাজ জীবনকে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। রাধারাণী তাই তো বলিতেছেন—"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।" ঘর ও বাহিরের সমন্বয় শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার আদর্শের মূল কথা। স্বামী স্ত্রীর একান্ত আপনও নয়, একান্ত পরও নয় এবং স্ত্রী স্বামীর একান্ত আপনও নয় একান্ত পরও নয়। এইভাবে বিশ্বরূপ জীবন যাপন করিয়া পরস্পরে যে সম্বন্ধ ইহাই পরকীয় সম্বন্ধ; স্বামীস্ত্রীর ভিতর এই পরকীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই ভবিষ্যৎ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িতে হইবে।

ঘরে মেয়েদের বাহিরের সাধ পূর্ণ হইতেছে না বলিয়া তাহারা বাহিরে ছুটিয়াছে। মূর্ত্তিমতী কলা হইতেছে নারী; সে আজ সকল কলা হইতে বঞ্চিত হইয়া নীরস হইয়া পড়িয়াছে, পুরুষের মন তাহাতে তৃপ্ত হইতেছে না। একদল মেয়ে তাই ঘর ভাঙ্গিয়া বাহিরে যাইয়া গানবাদ্যের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুরুষেরা ঘর ছাড়িয়া সেখানে যাইয়া ভিড় জমাইতেছে। এমনই করিয়া সমাজের প্রতি স্তরে

যে কি বিচ্ছৃঙ্খলা ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজকাল মেয়েদের কিছু কিছু গানবাদ্য ও নাচ শিখান হইতেছে বটে, কিন্তু পরিবারের অঙ্গাঙ্গিরূপে উহাকে গ্রহণ না করায় বিবাহের পর আর মেয়েদের সে গানবাদ্যের চর্চ্চা থাকে না। কাজেই সে শিক্ষা জীবনে কার্য্যকরীও হইতেছে না। সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইলে অতীতের সমস্ত চিন্তাধারাকে নূতন ছাঁচে ঢালিতে হইবে। পুরুষোত্তমদর্শনের উজ্জল ভিত্তির উপর গড়িতে হইবে নূতন জীবন্ত মুক্ত সমাজ।

স্মৃতি—তুমি নূতন জীবন্ত মুক্ত সমাজ গঠনের কথা বলিলে, আবার গান বাজনাকে পরিবারের অঙ্গাঙ্গিরূপে লইবার কথা বলিলে; মেয়েরা ঘরে যদি গান বাজনা লইয়াই থাকে, মা হইয়া সংসার করিবে কিরূপে? আর গান বাজনা লইয়া থাকিলেই কি জীবন্ত সমাজ গঠিত হইবে?

শ্রুতি—বুঝিতে পারিতেছ না স্মৃতি, আমি একটি সমগ্র জীবনের কথাই বলিতেছি। আমাদের দেশ নারীর জননী রূপেরই গৌরব দিয়াছে, নারীর রমণীরূপকে এ-দেশ গৌণ করিয়া দেখিয়াছে। সেইজন্য রমণী-জীবনের নাচ গান প্রভৃতি সকল কলাই বাদ পড়িয়াছে। ইহাতে জননীরূপের সবটুকু সম্মান ও স্থানই কি সে পাইয়াছে? নারীর জীবনবিকাশের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া, জগতের সকল ব্যাপার ও সকল ক্ষেত্র হইতে তাহাকে সরাইয়া আনিয়া একমাত্র ঘরের কোণে রান্নার হাতা-বেড়ীর মালিক করিয়া সমাজ ও শাস্ত্র তাহাকে সতী ও মাতা সাজাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহা কি সম্ভব হইয়াছে? নারীজীবনের যে ব্যাপকত্ব, বন্ধুত্ব রহিয়াছে তাহা পড়িয়াছিল বাদ। কিন্তু ইহা সে কতদিন কেমন করিয়া সহ্য করিবে? নারী মূর্ত্তিমতী কলা, তাহার জীবনের সকল কলাক্ষেত্র মুছিয়া ফেলিয়া সতী তৈয়ার করিতে যাইয়া সমাজ তাহার জীবন্ত সমাধিরই ব্যবস্থা করিয়াছে। নারীজীবনের নাচ, গান, বাদ্য, চিত্র, শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, শাস্ত্র ও বিজ্ঞান কিছুরই স্থান কি

বর্ত্তমান পরিবারজীবনে নারীর জন্য রহিয়াছে ? নারীকে জীবন্তরূপে—রমণীত্ব ও জননীত্বের সমন্বয়রূপে—পাইতে হইলে তাহার সমস্ত অধিকারই তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। জীবন্ত পরিবার গঠন করিতে হইলে প্রতি পরিবারকে বিশ্বজীবন যাপনের ক্ষেত্ররূপেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং বিশ্বের সকল ক্ষেত্রের সহিত তাহার যোগও রক্ষা করিতে হইবে।

প্রত্যেক মানুষই বিশ্ববাসী ; বিশ্বের সকল ক্ষেত্র বাদ দিয়া সে পূর্ণ মানুষ হইবে কি করিয়া? কোন-কিছু বাদ দিয়া পূর্ণ জীবনগঠন হয় না। অতীতের সমস্ত আদর্শ নারী-চরিত্রে কি ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় না যে, তাঁহারা সকল বিদ্যাসম্পন্না হইয়াই মা হইয়াছেন, এবং পরিবারজীবন যাপন করিয়াছেন। সুভদ্রার মত মেয়ের আদর্শ আমাদের দেশেই রহিয়াছে ; তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। যেদিন তিনি অর্জ্জুনের রথে সারথির কার্য্য করিয়াছিলেন, সেদিন রথ চালনার কি অপূর্ব্ব কৌশলই না দেখাইয়াছিলেন! তিনি বীররমণী, আবার তিনিই বীরমাতা। নিজ হাতে শিশু সন্তানকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মাঝে মৃত্যুর মুখে সাজাইয়া পাঠাইয়া দিতে তিনিই পারিয়াছিলেন। আমাদের দেশে আদর্শ বীররমণী, বীরমাতার উজ্জ্বল চিত্রের অভাব নাই। বর্ত্তমানেও যে সমস্ত মহীয়সী নারী দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর অনেকেই মা ও স্ত্রী এবং তাঁহাদের সংসারও আছে। তাঁহাদের সংসার ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ সংসার নয়, তাঁহাদের জীবনে বিশ্বরূপ রহিয়াছে। মা হইতে হইলে কি জীবনের সকল দিক বাদ দিয়া মা হইতে হয়, না হওয়াই যায়? বর্ত্তমান মেয়েরা জগতের সহিত সম্পর্কহীন হইয়া, জগন্মাতা না হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে, সেইজন্যই প্রকৃত মা কেহ হইতে পারিতেছে না। যিনি জগতের মা নন, তিনি নিজ পুত্রের মা হইবারও যোগ্য নন। বিশ্বমাতৃ-শক্তিরই কোলে সন্তান বীর হয়।

গানবাজনা কলার একটি প্রধান অঙ্গ ; জীবনকে সরস করিয়া

রাখিয়া সমগ্রভাবে আস্বাদন করিতে হইলে উহার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। পূর্ব্বে মেয়েদের গান-বাদ্য-নৃত্যাদি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও ছিল। বিরাটরাজদুহিতা উত্তরাকে বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন নৃত্যগীত শিখাইয়াছিলেন। বেহুলার নৃত্য দেখিয়া স্বর্গের দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মৃত স্বামীকে বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন। মীরাবাঈয়ের গানে বাদশাহ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। নারীজীবনে গান একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একটি পরিপূর্ণ জীবন গঠন করিতে হইলে নাচ, গান, বাদ্য, শিল্প, চিত্র, সাহিত্য, কাব্য, শাস্ত্র, বিজ্ঞান এই সমস্ত দিকের চর্চ্চাই রাখিতে হইবে। মেয়েদিগকে এই সকল যোগ্যতা লইয়া অথচ ছন্দ বজায় রাখিয়া মা হইয়া সংসার করিতে হইবে। মানুষ যখনই সকল স্তরের সকল যোগ্যতা লইয়া দাঁড়ায়, তখনই তাহার যোগেশ্বর ভগবানের সহিত যোগ হয়। সৎ ভগবানের সহিত যাহার যোগ হয়, তিনিই সতীশিরোমণি। সতের সহিত সকল প্রকারের যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়া, জীবনের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের কোণে সতী বানাইবার জন্য হুড়াহুড়ি ও সতী সাজিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টায় সমস্তই ব্যর্থ হইতেছে।

ভারতবর্ষে আদর্শ সতী, আদর্শ নারী যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই কলাবিদ্যাসম্পন্না বিদুষী রমণী ছিলেন। দ্রৌপদী সর্ব্ব বিষয়ে যোগ্য ছিলেন, বিশ্বেশ্বরের সহিত যুক্ত ছিলেন, বিশ্বসেবা করিয়াছিলেন, তাই তো তিনি সতী। তিনি ছিলেন স্ব স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত। ইহাই সার্থক সংসারজীবন যাপন করার কৌশল; স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বরূপ জীবনযাপনই সংসার করার কৌশল। যেখানে সংসার ও বিশ্ব এক হইয়া থাকে, সেই স্তরে দাঁড়াইয়া সংসার করিতে হয়। এইরূপ সংসারের অর্থাৎ বিশ্বরূপ সংসারের সেবা যে করে, সেও সার্থক হয়; যাহারা সেবা লয়, তাহারাও সার্থক হয়। এই সেবার ভিতর দিয়া নারী সতী, পুরুষ বিশ্ববিজয়ী সৎ হয়। সমগ্র জীবনের শিক্ষাই আজ নারী জাতিকে শিখাইতে

হইবে, যেমন-তেমন করিয়া ঘর করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। ডাক আসিয়াছে পূর্ণ মানুষ হইবার। নারী একাধারে রমণী ও জননী।

স্মৃতি—তোমার কথা শুনিয়া আমি যেন এক নূতন জীবনের স্পর্শ পাইলাম। কিন্তু কেমন করিয়া মেয়েদের ভিতর এই স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যের ভাবধারাকে জাগাইয়া তোলা যায়? কেমন করিয়াই বা পুরুষোত্তমদর্শনের ছাঁচে জীবন্ত সমাজ ও পরিবার গড়িয়া তোলা যায়, সেই সম্বন্ধে কিছু বল না ভাই?

শ্রুতি—এই চিন্তাধারা সমাজে দিতে হইলে, পরিবারজীবন গঠন করিতে হইলে প্রথমে মেয়েদিগকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে হইবে যে, অতীতে তাহারা কিরূপ অপমানিত জীবন যাপন করিয়াছে যাহার ফলে আজ তাহাদের ঘরছাড়া হইতে হইয়াছে, কি জন্য কি চাহিয়াই বা তাহারা ঐ অতীত ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে; বর্ত্তমান বিদ্রোহের ভিতর তাহারা আবার কোথায় ভুল করিতেছে, এবং নারীপ্রগতির ভবিষ্যৎ রূপই বা কিরূপ হইবে, তাহাও স্পষ্ট করিয়া ধরাইয়া দিতে হইবে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে চাই কতগুলি মেয়ে যাহারা হইবেন পুরুষোত্তমার্পিতমনোবুদ্ধি, সর্ব্বত্যাগিনী যৌগিনী, যাহাদের ত্যাগের ভিতর দিয়াই গড়িবে পরিবারের বাহিরে নারীসংঘ। মেয়েদের ভিতর আর একদল মেয়ে থাকিবেন ঘরে, যাহারা পুরুষোত্তমের বিপ্লবের বাঁশী শুনিয়াছেন ও উহার অর্থও বুঝিয়াছেন; কিন্তু সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া বাহিরে আসিবার সুযোগ পাইতেছেন না। এই দুই দল মেয়েকেই পুরুষোত্তমদর্শনের ভিতর অবগাহন করিতে হইবে এবং এই দুই দল পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া চলিবে। যখন ঘর ও বাহির একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন এইভাবে ঘর ও বাহিরের সমন্বয়ের উপরই গড়িতে হইবে ঘর, ঘরের শৃঙ্খলা।

ব্রজে ব্রাহ্মণপত্নীগণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অন্ন ভিক্ষায় চঞ্চল হইয়া স্বামীগণের নিষেধ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের মুখে অন্ন দিবার জন্য ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। অন্ন খাওয়ানো হইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদিগকে

ঘরে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, তখন তাঁহারা ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আমরা স্বামীদের নিষেধ সত্ত্বেও তোমার মুখে অন্ন দিবার বাসনায় ঘর ছাড়িয়া বনে আসিয়াছি। তাঁহারা আমাদিগকে আর ঘরে স্থান দিবেন না। আমরা ঘরে ফিরিয়া যাইব না।" তখন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মণপত্নীগণ, তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও, তোমাদের কোন ভয় নাই। ভগবানে অর্পিত প্রাণ যাহাদের, তাহাদের সেই ভগবৎসেবা-প্রবণ প্রাণকে কি সংসারধর্ম্মপালনে কেহ বাধা দিতে পারে? আমি বলিতেছি, তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও; তোমাদের স্বামীগণ তোমাদিগকে অধিকতর আদরের সহিত গুরুরূপে বরণ করিয়া লইবেন।" সত্যই ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণপত্নীগণকে আদরের সহিত গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন :—

অহো বয়ম্ ধন্যতমা যেষাং নস্তাদৃশীঃ স্ত্রিয়ঃ।
ভক্ত্যা যাসাং মতির্জাতা অস্মাকং নিশ্চলা হরৌ॥

"অহো, আমরা ধন্যতম যাহাদের এমন লক্ষ্মী স্ত্রী লাভ ঘটিয়াছে। ইহাদের ভক্তিতে আমাদেরও হরিতে নিশ্চলা মতি জন্মিল।" পুরুষোত্তমের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সেই আত্মসমর্পিত জীবন লইয়া যে সংসার গড়িয়া উঠে, সেই সংসারই সার্থক সংসার; সেই সংসারেই পুরুষ স্ত্রীকে, স্ত্রী পুরুষকে গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়া সার্থক হয়। এই সার্থক সংসারের চিত্রই সর্ব্বত্যাগী ভোলানাথের কোলে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী দুর্গাশক্তি।

ভগবান অবতরণ করেন সংসারকে ভাঙ্গিয়া সকলকে ঘরছাড়া সন্ন্যাসী সাজাইবার জন্য নয়। মানুষকে প্রকৃত মানুষ, প্রকৃত সংসারী সাজাইবার জন্যই তিনি আসেন। এতদিন ঘর এবং বাহিরকে, সন্ন্যাস এবং সংসারকে পৃথক করিয়া রাখিয়া মানুষ সংসার করিতে গিয়াছিল, সেইজন্য সংসার এবং সন্ন্যাস দুই-ই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। ভগবান তাঁহার সাধের সৃষ্টির এই বিপর্য্যয়গতি দর্শনে বেদনাতুর হইয়া, সংসার এবং সন্ন্যাসের সমন্বয়ের

ভিত্তিতে বিশ্বকে গড়িয়া তুলিবার জন্যই বিশ্বে অবতরণ করিয়াছিলেন। ধ্বংসোন্মুখ পরিবারজীবনের পুনর্গঠনের কৌশলই তাঁহার অবতরণ লীলার ভিতর নিহিত রহিয়াছে। ব্রজলীলার পরই তাঁহার দ্বারকালীলা। ব্রজ-লীলায় আছে কেমন করিয়া সকল অত্যাচারের, সকল ক্লীবত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা করিয়া, শ্রেণীসংঘর্ষের পথে না যাইয়া কেবলমাত্র হৃদয়ের বেদনা ও চোখের জলকে সম্বল লইয়া, সব প্রতিকূল আবেষ্টনকে চরিত্রমাধুর্য্যে হজম করিবার দুর্জ্জয় শক্তিসহায়ে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে বাহিরে সরিয়া দাঁড়াইয়া পুরুষোত্তমের মাঝে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, পুরুষোত্তম জীবন লাভ করিতে হয় ও জীবনে সার্থক হইতে হয়, তাহারই চিত্র। দ্বারকালীলায় দেখাইয়াছেন কেমন করিয়া পুরুষোত্তমে অর্পিত হইয়া, পুরুষোত্তমকে লইয়া সংসার করিতে হয়, সংসার-যাত্রাকে সার্থক করিতে হয়, তাহারই চিত্র।

স্মৃতি—তুমি সংসারকে গড়িতে হইলে দুই দল মেয়ের কথা কেন বলিতেছ ? একদল মেয়ের বাহিরে থাকিবার কি নিতান্তই প্রয়োজন রহিয়াছে ?

শ্রুতি—দুই দল মেয়ের কথা কেন বলিলাম তাহা শোন। একদল সর্ব্বত্যাগিণী ঘরছাড়া মেয়ে বাহির হইতে মুক্তির বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া আসিবে, তাহাকে আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দিবে ; অপর একদল মেয়ে ঘরের ভিতর থাকিয়া সেই মুক্তির বার্ত্তাকে নিজেদের বুকে বরণ করিয়া লইবে, গৃহসংস্কারের কাজে লাগিয়া যাইবে। ঘরের ভিতর একদল মেয়ে পুরুষোত্তমদর্শনের ছাঁচে ঘরকে গড়িয়া তুলিতে প্রাণপণ করিবে, অপর একদল মেয়ে বাহির হইতে দিকে দিকে এই পুরুষোত্তমদর্শন প্রচার করিবে। এই প্রকারে যদি একদল ঘরের ভিতর হইতে ধাক্কা দেয়, এবং আর একদল বাহির হইতে ধাক্কা দেয়, তাহা হইলেই জীর্ণ সমাজের ভিত্তি চূর্ণ হইয়া পড়িবে। এই দুই দল মেয়ের প্রাণবন্ত ধাক্কার ভিতর দিয়াই উচ্ছৃঙ্খল সমাজ গড়িয়া উঠিবে পুরুষোত্তম-

দর্শনের ছাঁচে উজ্জ্বল সমাজরূপে। তুমি তো জান পুরাকালে গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্না একদল মেয়ে ঘরের বাহিরেই ছিলেন। সংসারকে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে আলোকিত রাখিবার জন্য, সংসারের ছন্দ ঠিক রাখিবার জন্য আচার্য্যরূপে একদল মেয়ে এবং একদল ছেলে ঘরের বাহিরে থাকিবেই; তবে সংখ্যায় তাহারা থাকিবে কম। বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যেরূপ লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী ভিক্ষার পাত্র বাড়াইয়াই তুলিয়াছে, সেরূপ নয়। প্রকৃত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর শক্তি অসীম। তাহাদের ব্রহ্মশক্তিতেই ভোগবহুল সংসারক্ষেত্র সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হয়।

পূর্ব্বে প্রত্যেক রাজা মুনিঋষিদের নির্দ্দেশ লইয়াই রাজ্যকে পরিচালনা করিতেন। আবার দেখ—কংগ্রেসের একদল লোক কাউন্সিলে ঢুকিয়াছিলেন, অপর একদল রহিলেন বাহিরে। যাহারা কাউন্সিলে ঢুকিয়াছিলেন, তাঁহারা সেখান হইতে জনসাধারণের জীবনপথে চলিবার উপযোগী যত কিছু সুযোগ সুবিধা করিয়া দিবার জন্য, আইন পাশ করাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপর একদল যাহারা বাহিরে রহিলেন, তাঁহারা বাহিরে জনসাধারণের ভিতর তাহাদের অবস্থা এবং তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বোধ জাগাইয়া রাখেন। জনসাধারণ তাহাদের অধিকার, তাহাদের দাবী যাহাতে কাউন্সিল হইতে পাশ করাইয়া আনিতে পারে, ইঁহারা সেইরূপ প্রেরণাই দিতেছেন। একদল বাহির হইতে পরিধিতে দাঁড়াইয়া দিতেছেন ধাক্কা, অপর দল ভিতর হইতে কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া করিতেছেন গঠন। এই জন্যই দুইদল মেয়ের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যে একদল মেয়ে ঘরের বাহিরে রহিল, তাহাদের বাহিরে থাকাটা ঘরকে গড়িয়া তুলিবার জন্যই শুধু; বাহিরে যাইবার জন্যই তাহাদের বাহিরে যাওয়া নয়। ঘরের মেয়েরা যখন বিশ্বরূপ জীবন যাপন করিবে, বিশ্বের ভাবনা ভাবিবে, তখনই হইবে ঘর এবং বাহিরের সমন্বয়। বাহিরের মেয়েরাও যখন ঘরের ভাবনা ভাবিবে অর্থাৎ সমাজের কল্যাণ, পরিবারের কল্যাণ এবং

বিশ্বের কল্যাণের কথা ভাবিবে, তখনই হইবে সংসার এবং সন্ন্যাসের সমন্বয়।

স্মৃতি—সংসার এবং সন্ন্যাসের সমন্বয়ের রূপ কি? এই সংসার এবং সন্ন্যাসের সমন্বয়-আদর্শ বর্ত্তমান বিশ্বে কাহার দান?

শ্রুতি—এপর্য্যন্ত যাহা কিছু বলিয়াছি সমস্তই সন্ন্যাস ও সংসারের সমন্বয়ের কথা। জ্ঞান হইতেছে সন্ন্যাসের রূপ, কর্ম্ম হইতেছে সংসারের রূপ; জ্ঞানের স্বরূপ মুক্তি, সংসারের স্বরূপ বন্ধন; জ্ঞান পুরুষ, কর্ম্ম প্রকৃতি। জ্ঞান আসিয়া যখন কর্ম্মকে আলিঙ্গন করে, তখনই বদ্ধ কর্ম্মময় সংসার মুক্ত জ্ঞানী পুরুষের আলিঙ্গনে মুক্ত হয়। জ্ঞান এবং কর্ম্মের যুগল মিলনেই মুক্ত বিশ্ব, অবধূত বিশ্ব গড়িয়া উঠে; তখনই হয় সংসার এবং সন্ন্যাসের সমন্বয়। এতক্ষন ধরিয়া তোমার সহিত যে আলোচনা করিয়াছি, তাহার ভিতর এই কথাটাই বলিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছি। এই সংসার ও সন্ন্যাসের সমন্বয় বর্ত্তমান বিশ্বে যুগ-দেবতা পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের দান।

এ পর্য্যন্ত কোন মঠে কোন সন্ন্যাসী মেয়েদের স্থান দিতে সাহস পান নাই। পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার মঠে মেয়েদের স্থান দিয়াছেন। তিনি আকার এবং নিরাকারের, সংঘ ও আদর্শের সমন্বয়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন, জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। যাহা-কিছু আবেষ্টন তাহাই আকার, তাহাই প্রকৃতি। যাহা-কিছু আদর্শ, নিরাকার, তাহাই পুরুষ। এই আকার ও নিরাকারের সমন্বয়মূর্ত্তি পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল। তিনি নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থ পুরুষ, তথাপি চারিদিকের ঘটনারূপিণী প্রকৃতিবেষ্টিত। তিনিই করিয়াছেন বিশ্বের সামনে প্রকৃতির গৌরবময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা। তিনিই দেখাইয়া গিয়াছেন যে, প্রকৃতি সন্ন্যাসের ও ব্রহ্মজ্ঞানের একান্তভাবে বাধাই নয়, সে সন্ন্যাসের রক্ষকও বনিতে পারে। তাঁহার কাছে প্রকৃতির স্থান কত বড়, কত উচ্চে! ব্রজলীলাতে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণও ইহাই

দেখাইয়াছেন। পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল ছিলেন অবধূত। কামিনী-কাঞ্চনের পারমার্থিক বিশ্বরূপ ফুটাইয়া সকল ঝঞ্ঝাট হজম করিয়া যে সমাধি, উহাই অবধূতের সমাধি। অবধূতশিরোমণি শ্রীনিত্যগোপাল সংসার একান্তভাবে ত্যাগ করিয়া যে সন্ন্যাস, তাহা শিখাইতে আসেন নাই। তিনি সংসারের সকল বিষ হজম করিয়া যে অবধূত জীবন, তাহাই বিশ্বের সামনে রাখিয়া গিয়াছেন। উদ্‌ভ্রান্ত বিশ্ব এই অবধূত-জীবনে অবগাহন করিয়াই স্বস্বরূপে স্থিত হইবার জন্য পাগলের মত ছুটিয়াছে।

স্মৃতি—আজ ভাই, তোমাকে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম। ধর্ম্ম এবং সংসারের নূতন রূপ দেখিয়া আমার যে কি আনন্দ হইতেছে, তাহা বুঝাইবার ভাষা আমার নাই। মনে হইতেছে অতীতের সকল সংস্কার ঝাড়িয়া ফেলিয়া জীবনকে এই পুরুষোত্তমদর্শনের মাঝে গড়িয়া তুলি। এতদিনের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা আজ যেন সার্থকতায় গড়িয়া উঠিবার জন্য ব্যাকুল। আমার আরও কয়েকটী প্রশ্ন রহিয়াছে, বলিতেছি শোন। অতীতে যে ছোট মেয়েদের বিবাহের প্রথা ছিল, তাহাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ছিল, না বর্ত্তমানে যে মেয়েদের বড় করিয়া বিবাহ দেওয়া হইতেছে তাহাতেই সমাজের কল্যাণ হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কি মত?

শ্রুতি—ছোট মেয়ের বিবাহ দিবার ভিতর রহিয়াছে মেয়েদের নিজস্ব কোন স্বাতন্ত্র্য, কোন ব্যক্তিগত সত্তাকে স্বীকার না-করার ব্যবস্থা। মেয়েদের যে বয়সে বিবাহ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই জন্মে না তখন শুধু অভিভাবকদের ইচ্ছামত তাহাদের বিবাহ দিয়া দিলে একটা কাঠামোর মধ্যে পড়িয়া যাইয়া তাহার চাপে আর কোন দিন তাহাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিতে পারে না। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের সম্ভাবনাকে চিরতরে লোপ করিয়া দেওয়াই ছিল বারো বছরের আগেই মেয়েদের বিবাহ দিবার ব্যবস্থার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। অল্প বয়সে স্বামীর পরিবারের ভিতর

যাইয়া নিজস্ব সত্তা তাহাদের ভিতর ডুবাইয়া দিয়া তাহারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকিত। ইহার ফলে কিছু দিন সমাজ শৃঙ্খলা অব্যাহত রহিল বটে, কিন্তু সংসারে মান না পাইয়া, তাহার বিশ্বরূপ জীবনের খোরাক না পাইয়া নারীজীবন গেল শুকাইয়া এবং সঙ্কীর্ণ হইয়া। পূর্ব্বে যে ৫।৭ বৎসরের মেয়েদের বিবাহ হইত, তাহারই প্রতিক্রিয়ার ফলই হইতেছে আজ মেয়েদের বিবাহ না-করা বা বড় হইয়া বিবাহ করা প্রভৃতি।

কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষা না পাইয়া অথচ বড় হইয়া মেয়েদের বিবাহ হওয়ার ফলে সমাজে যে বিশৃঙ্খলা চলিতেছে, তাহাও তো লক্ষ্য করিবার বিষয়। মেয়েদের বিকৃত স্বাতন্ত্র্য-বোধ জাগ্রত হওয়ায়, পরিবার আর একান্নবর্ত্তী পরিবাররূপে গণ্য হইতে পারিতেছে না। একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া যাওয়ার অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য আর যে কারণই থাকুক না কেন, মেয়েদের এই বিকৃত স্বাতন্ত্র্যবোধ যে একটি প্রধান, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অপরকে সহ্য করার মনোবৃত্তি তাহাদের বিশেষভাবে লোপ পাইয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকৃত বোধ তাহাদিগকে কেবল নিজেকেই প্রাধান্য দিতে শিখাইয়াছে। নিজ বলিতে তাহারা যাহা বুঝিতেছে, তাহা সমগ্রতার স্পর্শহীন একেবারেই একটি বিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তির ফল। সেই স্ব স্ব প্রাধান্যে পরিবারজীবন অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

কল্যাণ কোন পথেই নাই, যদি সমাজের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন না হয়। প্রাচীনকালে কি মেয়েরা বড় হইয়াই পতি বরণ করিতেন না? শিশু বয়স হইতেই তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের আদর্শ তাহাদের সমগ্র জীবনকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিত। সাবিত্রী, সুভদ্রা, দময়ন্তী প্রভৃতি বড় হইয়া, বহু শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া নিজেদের স্বামী নিজেরাই নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ ও

সমগ্র ক্ষেত্রের সেবা আজও জগতের বুকে অম্লান। এই প্রকার আমাদের দেশে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগের বহু নারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। দোষ বড় করিয়া বিবাহ দিবার ভিতরেও নয়, ছোট থাকিতে বিবাহ দিবার ভিতরেও নয়; দোষ রহিয়াছে সমাজগঠনের কৌশলের ভিতরে, দোষ রহিয়াছে সমাজের শিক্ষার ভিতর। গতিধর্ম্মী পুরুষোত্তমদর্শনের সমগ্রতার ছাঁচে যদি সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবার গঠিত হইত, তাহা হইলে বড় হইয়াই বিবাহ হউক বা ছোট থাকিতেই বিবাহ হউক, তাহাতে কিছুই দোষ হইত না, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও বজায় থাকিত অথচ সমগ্রের উপরও কোন আঘাত পৌছিত না। যে যে স্তরে, যে অবস্থায়ই থাকিত, সে সেখান হইতেই তাহার স্বরূপ-বিশ্বরূপ জীবনের দুই দিকের আস্বাদন করিয়া সার্থক হইত; কোনও অভিযোগ তাহাদের জীবনে থাকিত না। তবে আট, নয়, বারো বৎসরে বিবাহ সমর্থন করা যায় না। মেয়েদের জীবনের সমগ্র দিক দিয়া বিচার করিলে ষোল হইতে আঠারো বৎসরের মধ্যে বিবাহ দেওয়াই কল্যাণকর হইবে বলিয়া মনে হয়।

স্মৃতি—তুমি বলিয়াছ মনু মেয়েদের কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"। কিন্তু তিনি তো কন্যাকে অতি যত্নসহকারে রক্ষণ ও পালনের কথাও বলিয়াছেন। এবং নারীজাতি যে পূজার যোগ্য তাহাও তো বলিয়াছেন, তবে আর মনু মেয়েদের উপর কি অবিচার করিয়াছেন? আমার মনে হইতেছে, তুমিই মনুযাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহাপুরুষদের উপর অবিচার করিতেছ।

শ্রুতি—মনুযাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আমার নমস্য; তাঁহাদের জীবনসম্বন্ধে বিচার করিবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। কিন্তু তাঁহাদের লিখিত শাস্ত্রের যে অংশকে কেন্দ্র করিয়া এই অচলায়তন সমাজ গড়িয়াছিল এবং

ক্রমপরিণতিতে যাহা আজ আমাদের চোখের সামনে বাস্তবরূপে দেখা দিয়াছে, আমি তাহার কথাই বলিতেছি। তাঁহারা যে সময় শাস্ত্র লিখিয়াছিলেন, তখনকার দেশকালপাত্রের উপযোগী করিয়াই লিখিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে আজ অতীতের সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করারও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যে শাস্ত্রদ্বারা এক যুগে কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রই অন্য যুগে বিকৃতরূপ ধরিয়া অকল্যাণের সৃষ্টি করে। এই জন্য অতীতের শাস্ত্র হইতে যে দোষের সৃষ্টি হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার আলোচনা করিয়া, শোধরাইয়া লইয়া বর্ত্তমান দেশকালপাত্রানুযায়ী শাস্ত্র দিতে হইবে।

স্বীকার করি, মনু নারীজাতিকে "পূজার্হাঃ গৃহদীপ্তয়ঃ" বলিয়া অর্চ্চিত হইবার যোগ্য বলিয়াছেন, কন্যাকে অতি যত্নসহকারে রক্ষণ ও পালনের কথাও বলিয়াছেন। আবার তিনিই "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" ও তো বলিয়াছেন। যেখানে নারীর স্বাতন্ত্র্যই স্বীকার করা হয় নাই, সেখানে নারী পূজিতা হইবার যোগ্য, কন্যা অতি যত্নসহকারে পালনীয় —এ সকলের অর্থ কি ইহাই হয় না যে, যদিও নারীর কোন স্বতন্ত্র মূল্য, স্বতন্ত্র মর্য্যাদা নাই, তথাপি সহায়ক-হিসাবে সংসারগঠনে যখন তাহার বিরাট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, "অতএব" তাহাকে আদরযত্নও করিতে হইবে, সেইভাবে লালনপালনও করিতে হইবে। গোড়ায় যাহার স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকৃতই রহিয়া গেল, সংসারগঠনরূপ প্রয়োজনের তাগিদেই যখন তাহাকে ঘরে আনা হইল, তখন কি ইহার মধ্যে একটা অভিসন্ধিই ফুটিয়া উঠিতেছেনা? এই আদর কি সত্যই আদর? এই শিক্ষা কি সত্যই শিক্ষা?

বর্ত্তমানে নারীজাতি পুরুষের নিকট হইতে এই অভিসন্ধিমূলক আদর যত্নই পাইতেছে। ব্রিটিশও ভারতবর্ষকে প্রচুর সুযোগসুবিধাই দিয়াছে; সে যে আমাদের কোনও অকল্যাণ করিতে পারে, এক সময় ইহা জন-

সাধারণ ভাবিতেও পারে নাই। আমাদের জন্য ইংরাজরাজ কতই না করিয়াছে! আমাদের শিক্ষার জন্য কত স্কুল কলেজ খুলিয়াছে; আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছে; আমাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রেলষ্টীমার প্রভৃতি যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে; সংবাদ আদানপ্রদানের বৈজ্ঞানিক সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে; দুষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কত আইনকানুন, কোর্ট কাছারী তৈরী করিয়াছে; মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, গ্রামোফোন কতই না ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের জন্য করিয়াছে। কিন্তু এত দিয়াও সে যে কিছুই দেয় নাই, এত করিয়াও যে কিছুই করা হয় নাই তাহা আমাদের চোখে আজ স্পষ্ট। ইংরেজ সবই দিয়াছিল স্বীকার করে নাই শুধু আমাদের স্বরাজ। স্বরাজহীন ভারতবর্ষের মর্য্যাদা নাই, স্বতন্ত্রতা নাই; সর্ব্ববিষয়ে সে অপরের হাতের পুতুলমাত্র। ইহারই পরিণতিতে আজ আসিয়াছে কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী, রাষ্ট্র-বিপ্লব। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিও নারীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করিয়া, তাহার স্বতন্ত্রতার মর্য্যাদা না দিয়া অনেক কিছু সুযোগসুবিধা, আদরসম্মান দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বিপ্লব আটকানো যায় নাই, আজ আসিয়া পড়িয়াছে বর্ত্তমান নারীপ্রগতি। বাস্তব ক্ষেত্রে কালের বুকে যে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহা বলিলে যদি অবিচার হয় বলিতে চাও, তাহা হইলে আমি আর কি করিব বল?

স্মৃতি—বিধবাবিধবা সম্বন্ধে তোমার মত জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। বিধবাদের ব্রহ্মচর্য্যজীবন যাপন করাই সঙ্গত না পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসার করাই উচিত?

শ্রুতি—এখানেও প্রশ্ন সেই সমাজশিক্ষারই, বিবাহ করা বা না-করার নয়। মেয়েরা যখন বিধবা হয়, তখন তাহাদিগকে যদি কোন বড় ব্যাপক আদর্শ না দিয়া, ঘটনাবহুল ভোগবহুল সংসারের

বিবাহাদি নানা প্রকার ভোগবিলাসের মধ্যে প্রতিনিয়ত রাখিয়াই দেওয়া হয়, তখন তাহাদের পুনরায় বিবাহিত জীবনযাপন করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়াটাই স্বাভাবিক। এরূপ স্থলে বাহির হইতে চাপানো ব্রহ্মচর্য্য কি কার্য্যকরী হইতে পারে? আবার বিচারের অবসর না রাখিয়া সবাইকেই যদি বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হয়, তাহাও তো ঠিক হইবে না। ব্রহ্মচর্য্য-জীবন যাপন করিবার অনুকূল মনোবৃত্তি লইয়াও তো অনেকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এইজন্যই বলিলাম বিবাহ করা বা না-করার মূলে রহিয়াছে শিক্ষা। সমাজের প্রয়োজন হইতেছে সর্ব্বাগ্রে জীবন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের সামনে বিশ্ব সেবার চিত্র আঁকিয়া ধরা এবং সেই বিশ্বসেবার দ্বার খুলিয়া দেওয়া। তাহা না করিয়া বাল্যকালে যখন মেয়েদের স্বাতন্ত্র্যবোধই জাগ্রত হয় নাই, সেই সময় তাহাদিগকে বিবাহ দেওয়া এবং ২।৪ মাস বা ২।৪ বৎসর পর যদি তাহারা বিধবা হয় তখন সেই কচি প্রাণ-গুলিকে আর বিকশিত হইতে না দিয়া তাহাদের জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষাকে দাবাইয়া কঠোর শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্যের বোঝা চাপাইয়া দেওয়াকে মানবতার দিক দিয়াই সমর্থন করা যায় না। এমন করিয়া তাহাদের মানুষজন্মকে ব্যর্থ করিয়া দিবার কি অধিকার আছে সমাজের?

সমাজ তাহার আইনের চাপে বিধবাদিগকে ব্রহ্মচারিণী সাজাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহা পারে নাই। সে সাজাইয়াছে একদল স্বেচ্ছাচারিণী নারী, আর একদল জীবনের সকল প্রেরণাহীন, অসার, ব্যর্থ, কতকগুলি প্রাণ যাহারা সমাজের গলগ্রহমাত্র। এইজন্য দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই বিধবাবিবাহের সুযোগ লইয়া পুত্রকন্যার মাতারা যখন-তখন পুত্রকন্যাকে ভাসাইয়া দিয়া বিবাহ করিতে ছুটিবেন—বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে যে এই যুক্তি দেখানো হয় তাহা সঙ্গতও নয়, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত তাহার সমর্থনও করে না।

ব্রাহ্মসমাজ বিধবার বিবাহ মানিয়া লইয়াছেন; কিন্তু সব বিধবাই সেখানে বিবাহিত হন নাই। মানুষের উপর বিশ্বাস হারাইয়া শুধু আইনের সাহায্যে তাহাকে ভাল করিবার প্রচেষ্টা মানুষের অন্তরাত্মার সঙ্গে বিদ্রোহমাত্র। মেয়েদের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিতে হইবে পরিবারসেবা, সমাজসেবা, বিশ্বসেবারূপ সমগ্রের উজ্জ্বল আলো; সেই আলোকে তাহারা স্থির করিয়া লইবে তাহাদের গন্তব্য স্থান ও চলার ছন্দ। এই সমগ্রতার, এই ব্যাপকতার আদর্শকে বিবাহিতা, অবিবাহিতা, বিধবা প্রত্যেক নারীজীবনের সামনে ধরিয়াই তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিশ্বসেবার সহিত যুক্ত না থাকিয়া কোন বিবাহিতা নারী নিজের পতিকে লইয়াও সতীত্ব রক্ষা করিতে পারে না। যেখানে সে একান্ত ভোগ্যারূপে গৃহীত, সেখানেই সে অসতী। কোনও নারী কি আজ সমস্ত দেহ মন প্রাণ দিয়া স্বামীর কাছেই নিজকে সমর্পণ করিতে পারিতেছে? তাহার পঞ্চকোষের ক্ষুধা, তাহার সমগ্র জীবনের ক্ষুধা কি বর্ত্তমানে তাহার ঘরে মিটিতেছে? সে কোন প্রকারে স্বামীর নিকট দেহ দান করিয়া সংসার করিতেছে মাত্র। তাই সেখানে ব্যাভিচার থাকিয়াই যাইবে, যদি সেই সঙ্গে ঘরের বাহিরে বিশ্বসেবার জীবন না থাকে। স্বামীসেবারূপ ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসেবারূপ সমষ্টির জীবনও যে একটী সমগ্র নারীজীবনের পক্ষে তুল্য সত্য। সেই সত্য আকাঙ্ক্ষার খোরাক না জোগাইলে উহা বিকৃত আকাঙ্ক্ষারূপে ব্যক্তি ও তথা সমাজদেহে আত্মপ্রকাশ করিবেই। এইজন্য প্রত্যেক নারী-জীবনের সামনে বিশ্বসেবার পথ খুলিয়া রাখিতেই হইবে। ঘরের সেবা ও বিশ্বের সেবা মিলিয়া মেয়েদের যে জীবন গঠন হইবে, সেই জীবনই আনিবে ঘরের কল্যাণ। নতুবা তাহাদের সহজ চলার পথকে আইনের তালা চাবী দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া ব্রহ্মচর্য্যের বোঝা চাপাইতে গেলে

তাহা ব্যর্থই হইবে। মানুষের চলার যদি ব্যাপক ক্ষেত্র না থাকে, সাধ্য কি সে সংযমী হয়? নারী যে স্বরূপতঃ শ্রীরাধা। বড় বড় কর্ম্মীজীবন দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। সকল দিকের মাত্রা বজায় রাখিয়াই তাহাদিগকে চলিতে হয়। সংযমী না হইলে বিশ্বসেবা করিবে কিরূপে? মানুষের জীবনের মূল কেন্দ্র যেখানে, যদি সেখান হইতে তাহাকে চলিবার পথ খুলিয়া না দেওয়া হয়, বাহির হইতে কতগুলি সুযোগসুবিধা প্রদানের দ্বারা কি জীবনের বাস্তব কোন সমস্যার স্থায়ী সত্যকার মীমাংসা হয়?

স্মৃতি—মেয়েরা যে পুরুষের সহিত স্কুল কলেজে যাইতেছে, বি-এ, এম্-এ পাশও করিতেছে, চাকুরী করিয়া টাকা আনিতেছে, আবার বিবাহিতা মেয়েদের আইনতঃ বিত্তে অধিকারও নাকি জন্মিতেছে—ইহাতেই কি মেয়েরা পুরুষের সমকক্ষ হইতেছে? নারী ও পুরুষকে তো বিধাতা সৃষ্টিই করিয়াছেন পৃথক করিয়া, সমকক্ষ হইবে তাহারা কোথায়? কিরূপে? নারী যদি সমকক্ষতার দাবী লইয়া বাহিরে চাকুরী করিতে বাহির হয়, ঘরের মাতৃত্ব রক্ষা করিবে কে?

শ্রুতি— দ্রষ্টা-দৃশ্যের সংযোগের যে তত্ত্ব পুরুষোত্তমদর্শন শুনাইয়াছে সেই সেই দার্শনিক ভিত্তির উপরই নারী পুরুষের সমকক্ষ হইবে। এই দার্শনিক ভিত্তির উপর যদি সমকক্ষতা স্থাপন না করা যায়, নারীর উপর যদি হেয়ত্বের আরোপ চলিতেই থাকে, তাহা হইলে শুধু স্কুল কলেজে যাইয়া, চাকুরী করিয়া কিম্বা বিত্তে অধিকার পাইয়াও সমকক্ষতা পুরাপুরি কার্য্যকরী হইবে না। পুরুষ এবং নারী যদি উভয়ের স্তর বদলাবদলি করিয়া উভয়ে উভয়কে দেখিতে পারে, তবেই হইবে সমকক্ষতার দাবী সার্থক, সমকক্ষতার দেনা-পাওনাও সার্থক। দ্রষ্টা-দৃশ্যের সংযোগের এতদিনকার অন্তর্নিহিত হেয়ত্ব মুছিয়া ফেলিয়া গৌরবময় প্রাণখোলা মিলনের ভিতর দিয়া পুরুষ-প্রকৃতির যে পারস্পরিক স্বীকৃতি—সেই স্থানেই নারী পুরুষের সমকক্ষ। এই সমকক্ষতা তত্ত্বতঃ সত্য। এই তাত্ত্বিক সত্যকে যে সমাজব্যবস্থা

ব্যবহারক্ষেত্র এই সংসারের খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা, পড়াশুনা, অর্থোপার্জ্জন, বিত্তে অধিকার প্রভৃতি ব্যাপারে যতখানি রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছে, সে সমাজ ততখানি ভদ্র, সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে। শুধু আইনের ব্যবস্থায়ই কি জীবন গঠিত হয়? আইন করিয়া মেয়েদিগকে বিত্তে অধিকার সমাজ দিতেছে, ভালই। তাহাদের অর্থের তো প্রয়োজন আছেই, কোন কোন স্থানে তো বিশেষরূপেই আছে। কিন্তু বিত্তে অধিকারের মূলে যদি প্রাণের অধিকার না পায়, সে বিত্তে কি মেয়েদের জীবনের সমস্যা মিটিবে? না তাহাদের হাতেই উহা থাকিবে? প্রাণই সমতা স্থাপনের কেন্দ্রস্থল। নারী প্রাণ দিয়া সংসারকে গড়িয়া তুলিবে, পুরুষ বুদ্ধি দ্বারা তাহার পরিচালনা করিবে।

নারী প্রাণ-প্রধান, পুরুষ বুদ্ধি-প্রধান; একটি পরিবার গঠনে উভয়ের অধিকারই সমান, ক্ষেত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। বিত্ত রক্ষা করা বা অর্থ উপার্জ্জন করা বাহিরের কাড়াকাড়ির মধ্যে বহু ঝঞ্ঝাটময়; সেখানে বুদ্ধির সুযোগই বেশী; তাহার উপর বাহিরের অত ছুটাছুটি কি মেয়েদের পক্ষে সব সময়ে সম্ভব? সেজন্য বিত্ত পুরুষের হাতে থাকিলে কোন ক্ষতি হইত না, যদি পুরুষ পুরুষোত্তমজীবনে জীবন মিলাইয়া অনুভব করিত যে বিত্তে অধিকার নরনারী উভয়েরই সমান, শুধু উহা অর্জ্জন ও রক্ষা করার ভারই প্রধানতঃ আমার উপর। স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ দেহের ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে অনেকখানি দুর্ব্বল, আবার প্রাণের ক্ষেত্রে তাহারা পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশি সবল, প্রাণের ক্ষেত্রে সে কন্যা, ভগ্নী, বন্ধু, স্ত্রী, মাতা। এই প্রাণের ক্ষেত্রেই নারীর নিজস্ব গৌরবের অধিকার। এই অধিকারের বিশেষ প্রকাশ হইল পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্ব-জীবন গড়িয়া তোলায়। সেখানে তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতেছে জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করা। প্রাণই সকলকে মিলাইয়া লইয়া চলিতে পারে, এই প্রাণের কাছে পুরুষকে নত

হইতেই হইবে। ঘরকে নারী প্রাণের স্পর্শ দিয়া গড়িয়া তুলিবে, পুরুষকে প্রাণবান করিয়া তুলিবে। পুরুষের জন্য বাহিরের বুদ্ধির ক্ষেত্রের ধাক্কা সামলাইবার, জুড়াইবার স্থান রহিয়াছে ঘরে নারীর হৃদয়ে। একজন সম্রাটকেও কর্ম্মের ক্লান্তি জুড়াইবার জন্য, সবলতা লাভ করিবার জন্য ঘরে নারীর হৃদয়কেই আশ্রয় করিতে হয়। সে নারী মাতা, ভগ্নী, বন্ধু, স্ত্রী, কন্যা। এই হৃদয়ের ক্ষেত্রে নারী রাণী। পুরুষ যখন এই হৃদয়ের নিকট আশ্রয় লয়, তখন নারী অগ্রগামী, প্রধান। আবার বুদ্ধির ক্ষেত্রে পুরুষ প্রধান ও অগ্রগামী, নারী তাহার পিছনে। একটী অখণ্ড পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্ব রচনায় উভয়েই উভয়ের ক্ষেত্রে প্রধান। এই বোধ, এই চিন্তাধারা যখন সমাজের ভিতর স্বাভাবিক ভাবে গৃহীত হইবে, তখনই হইবে নারীর সমকক্ষতা স্থাপন।

স্মৃতি—তোমাদের পুরুষোত্তমদর্শনে দুঃখিনী ধর্ষিতা নারীর স্থান সমাজে কোথায় জানিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।

শ্রুতি—জীবনের রক্ত-মাংসের ভিতর দিয়া শুচি-অশুচির যে মানদণ্ড সমাজে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে, সেই শুচি-অশুচির মাপ কাঠি দিয়া বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান বাহির করা যাইবে না। অত্যাচারিতদের কবলমুক্ত ধর্ষিতা মেয়েদিগকে সমাজে গ্রহণ করিবার বিধি আজ সমাজ-পতিরা দিয়াছেন। কিন্তু অতীতের শুচি-অশুচির সংস্কার মানুষের এতটুকুও বদলায় নাই অথচ কালের ধাক্কায় আবেষ্টনের চাপে মানুষ উহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইতেছে মাত্র। দীর্ঘদিনের সংস্কারও কিন্তু ভিতর হইতে তাহাদিগকে ধাক্কা দিয়া চলিয়াছে। একজন ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন—"গুণ্ডাদের কবলমুক্ত ধর্ষিতা নারীকে, সমাজপতিদের ব্যবস্থার জোরে ঘরে স্থান দিলাম বটে, কিন্তু সেই অপবিত্রা নারীকে "প্রাণ খুলিয়া" আদর করিব, গৌরব দিব কি করিয়া?" মেয়েরাই কি খোলাপ্রাণে ঠিক পূর্ব্বের মত ঘরে যাইতে পারিবে? সারা জীবন কি মেয়েরা অসতীত্বের গ্লানি

ও তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস অন্তরে অন্তরে বহন করিয়াই চলিবে না? সতীত্ব ও অসতীত্বের যে বিচারে তাহারা এতদিন অভ্যস্ত, সে বিচারে তো তাহারা অসতীই রহিয়া যাইতেছে। বাহিরের ব্যবস্থায় কি তাহাদের অন্তরের এই অসতীত্বের দাগ মুছিয়া যাইতে পারে? মেয়েরা ঘরে যাইবে, সমাজও ঘরে নিবে; কিন্তু তাহাদের প্রাণখোলা মিলন তো পূর্ব্বের মত আর প্রতিষ্ঠিত হইবে না, অন্তরের সংস্কার যে যেমন তেমনটিই রহিয়া গেল। বাইরের সংস্কারে অন্তরের সংস্কার বদলায় না। অন্তরের সংস্কার বদলাইতে চাই অন্তরের সাধনা। অন্তর ও বাহির উভয়েরই সংস্কার বদলাইতে হইবে।

ইহার সমাধান একমাত্র পুরুষোত্তম দর্শনের ভিতরই রহিয়াছে। পুরুষোত্তমদর্শনের দৃষ্টি ব্যতীত শুচি-অশুচির, সতীত্ব-অসতীত্বের যে প্রশ্ন বর্ত্তমানে উঠিয়াছে তাহার স্থায়ী মীমাংসা দেওয়া যাইবে না। মুনি গৌতমের ব্যবস্থায় অহল্যা অশুচি; তাই তাহার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ সে পাষাণী। গৌতমের শাস্ত্র "পাপোঽহম্ পাপকর্ম্মাহম্ পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ"—এই উক্তি হইতে রওয়ানা হওয়ায় মানুষ আগে পাপ, পাপকর্ম্মা, পাপসম্ভব; পরে পূণ্য কর্ম্ম দ্বারা পাপ-মুক্ত হইয়া, শুচি হইয়া সে ভগবানের হইতে পারিবে। মানুষ যে কবে কোথা হইতে কেমন করিয়া হঠাৎ পাপ হইতে উদ্ভূত হইল, তাহার খোঁজ এই শাস্ত্র দেয় নাই। এই শাস্ত্র মানুষের ভগবৎস্বরূপের স্তর হইতে সুরু না করিয়া শুধু পাপ কর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়াই করিয়াছে মানুষের বিচার, যাহার ফলে বর্ত্তমান সমাজে লক্ষ লক্ষ অহল্যা পাষাণে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, বর্ত্তমানের ধর্ষিতা নারীরাও পাষানী হইয়াই সমাজে থাকিবে। কাহার শ্রীচরণস্পর্শে তাহারা এই পাষাণত্বকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভক্তিপ্লাবিত হইয়া বিশ্বের প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া থাকিবে? সে শ্রীচরণ শুধু পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রেরই আছে।

শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টি অহল্যার পাপকর্ম্মের দিকে নয়; তাঁহার দৃষ্টি অহল্যার স্বরূপের দিকে। সত্যং শিবম্ সুন্দরম্ ভগবান হইতেই মানুষের উৎপত্তি; প্রত্যেক মানুষই যে স্বরূপতঃ চির পবিত্র। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ভগবান হইতে জাত মানুষ ভগবানের অংশরূপেই উদ্ভাসিত। "মমৈবাংশঃ জীবলোকে জীব ভূতঃ সনাতনঃ"—গীতা। মানুষের এই স্ব স্বরূপ হইতে মানুষকে দেখিলে বাহিরের যত কিছু অপবিত্র বা অশুচি তাহাকে স্পর্শ করুক না কেন, স্বরূপতঃ সে চির পবিত্র, স্বস্বরূপ তো তাহার ভাগবত সত্তাই। মানুষকে যখন এই দৃষ্টি দিয়া মানুষ দেখিতে শিখিবে, তখনই মানুষের সম্বন্ধে সত্য বিচার তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে। মানুষ এত পাপ করিতেই পারে না, যেখান হইতে অতি সহজে সে তাহার নিজস্ব স্বরূপ স্বসত্তায় ফিরিয়া যাইতে না পারে, যদি তাহার জীবনে পুরুষোত্তম-স্পর্শ লাভ হয়। মানুষ আগে মানুষ, তাই না মহাপ্রভু "কোথায় জগাই কোথায় মাধাই" বলিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল? আগে মানুষকে বুকে তুলিয়া লইয়া প্রাণের স্পর্শ দিয়া তবে তাহার পাপপুণ্যের বিচার।

পুলিশের দৃষ্টিতে চোর "চোর," কিন্তু মা বলিবেন "ও যে নীলমণি মোর"। ভাগবত ধর্ম্মের এই প্রাণপ্লাবনে কি যে পাপ, কি যে পুণ্য, তাহা বুঝিবার দিন আজ আসিয়াছে। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"। মানুষ পাপ হইতেও সত্য, পুণ্য হইতেও সত্য। এই খানে দাঁড়াইয়াই তো ভাগবতধর্ম্মে বারবনিতা চিন্তামণির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রচলিত চিন্তাধারার ভিতর থাকিয়া বুঝিবার উপায়ই নাই কি শুচি কি অশুচি। সদাশুচি পুরুষোত্তম চিন্তাধারায় যদি সমাজকে গড়িয়া তোলা যায়, তবেই শুধু সমাজে এই ধর্ষিতা মেয়েদের গৌরবময় স্থান মিলিতে পারে; নতুবা আইন, কানুন, যুক্তিতর্ক দ্বারা সমাজ তাহাদিগকে বর্ত্তমানে গ্রহণ করিলেও সত্যিকার মর্য্যাদা ধর্ষিতা নারীরা বর্ত্তমান সমাজে কিছুতেই পাইবে না। আজ প্রকৃতির

ভিতর দিয়া মানুষের ভাল-মন্দ শুচি-অশুচি, সতীত্ব-অসতীত্ব সমস্ত ভেদ ডিঙ্গাইয়া এক মনুষ্যত্বের স্তরে দাঁড় করাইবার জন্য ডাক আসিয়াছে। মানুষকে আজ সমগ্র প্রকৃত মানুষ হইতে হইতেই শুচি, সতী হইতে হইবে। অতীতের সমস্ত সু ও কু, শুচি ও অশুচির চাপ হইতে বর্ত্তমান সমাজের লক্ষ লক্ষ পাষাণীকে মুক্ত করিয়া তাহাদের স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপযোগী এই পুরুষোত্তম চিন্তাপ্রণালীর কৌশল শিখাইতে হইবে। এইজন্য চাই পুরুষোত্তম দর্শনের জ্ঞানধারা ও পুরুষোত্তম হৃদয়ের স্পর্শদ্বারা সমাজকে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা। অতীতের চিন্তাধারা বদলাইয়া না দিয়া কোন ব্যবস্থাই সমাজের স্থায়ী কল্যাণকর অবস্থা আনিতে পারিবে না। সমাজের স্বাস্থ্যকর অবস্থা আনিতে হইলে সমস্ত পুরুষ ও নারীকে এই পুরুষোত্তম দর্শনের আলোকে জীবনকে জ্ঞানে ও আনন্দে আলোকিত করিয়া তুলিতে হইবে। পুরুষোত্তম-জীবন লাভেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে। আমার সমস্ত আলোচনার ভিতর দিয়া এই জীবনবাদের কথাই আলোচিত হইয়াছে।

স্মৃতি—আজ তোমার নিকট বর্ত্তমান যুগোপযোগী পুরুষোত্তমদর্শন শ্রবণ করিয়া, পুরুষোত্তমদর্শনের আলোতে আমার নিজের ভিতরের দ্বন্দ্বের এবং বিশ্ব-প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল গতির মূলতত্ত্ব কোথায়, তাহা দেখিতে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম। পুরুষোত্তমদর্শনের দান যে অবধূত জীবন, সেই জীবনের আলো যেন আমার জীবনকে চুম্বন করিয়া এক মুক্তির আনন্দে ভরিয়া তুলিতেছে। সত্যই তুমি আজ আমার কাছে মুক্তির বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছিলে। আজ তোমাকে পাইয়া আমার উপবাসী মৃতপ্রায় প্রাণ পুরুষোত্তমামৃত পান করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তোমায় আর বেশী কি বলিব, ভাই। আমি আজ যে পুরুষোত্তম-জীবনের মন্ত্র তোমার নিকট পাইলাম তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া যেন তাহারই আলোকে সংসার ও সমাজের সেবা করিয়া সার্থক হইতে পারি।

শ্রুতি—স্মৃতি, তোমাকে পাইয়া, তোমার নিকট আমার প্রাণের বস্তু পুরুষোত্তমদর্শনের আলোচনা করিয়া আমি নিজেই ধন্য হইলাম বলিয়া বোধ করিতেছি। তোমার সহিত আমার বাল্যকালের যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল, তাহা আজ ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত হইল দেখিয়া কি যে আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা আর তোমাকে কি বলিব ? কাহারও নিকট তো আমার প্রাণের বেদনার কথা বলিতে পারি না, বুঝাইতে পারি না প্রাণের বেদনা কি ও কেন। তোমার ভিতর জীবনের প্রশ্ন সাড়া জাগাইয়াছিল সেই জন্যই তোমার নিকট বলিবার সুযোগ পাইলাম। মানুষের ভিতর যদি মানুষ হইবার বেদনা না জাগে, তাহা হইলে প্রাণের এ-কথা, এ-বেদনা কেহই বুঝিবে না। আজ তোমার নিকট আমার প্রাণের দাবী জানাইয়া বিদায় লইতেছি। বাল্যে যে প্রীতি আমাদের ভিতর বীজাকারে ছিল, তাহা পুরুষোত্তমজীবনের প্রেমসলিলে সিঞ্চিত হইয়া মহান মহীরুহে পরিণত হউক, তাহার ছায়ায় তাপ-দগ্ধ নারী-জীবন জুড়াইয়া যাইবে। যে পুরুষোত্তমমন্ত্র আজ তুমি হৃদয়ে বরণ করিয়া লইলে, উহার দ্বারা বিশ্বসেবা করিয়া সার্থক হও, আমাকেও সার্থক কর। তুমি ঘরের ভিতর থাকিয়া বিদ্রোহী মেয়েদের ভিতর এই বিপ্লবের বীজ বপন কর, এই নারী-প্রগতির জন্মকথা শুনাও। আমি বাহিরে থাকিয়া এই বিপ্লবের বীজ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দেই। আমার এই বিশ্বসেবায় বাল্যবন্ধু তোমাকে সঙ্গিনী রূপে পাইয়া আমি পরম পরিতৃপ্ত। পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন।